খোলাফায়ে রাশেদীন

মুল রচয়িতাঃ মুহাম্মদ আব্দুল মা'বুদ

আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সংকলকঃ ইলিয়াস আহমেদ

সহযোগিতায়ঃ তানজিল আহমেদ

ওয়েবসাইটঃ

প্রচেষ্টা

একটি ইসলামিক শিক্ষার ওয়েবসাইট

সংকলকের ভুমিকা

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ। প্রিয় ভাইবোনগণ, আমরা অনেকেই “আসহাবে রাসুলের জীবন কথা” বইটির কথা জানি। এবং অনেকে পড়েছিও। বইটি মোট চার খন্ডে (৪২ মেগা) অনেকেই ব্যান্ডউইথ সীমাবদ্ধতার কারণে ডাউনলোড করতে পারেন না বিধায় শুধু মাত্র চার খলিফা- হযরত আবু বকর সিদ্দিক, হযরত উমর, হযরত উসমান ও হযরত আলী (রা) এর সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত নিয়ে খোলাফায়ে রাশেদীন নামে আমি এ সংকলণটি প্রকাশ করছি। আশাকরি আপনাদের কাজে লাগবে। ধন্যবাদ সবাইকে।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা)

আব্দুল্লাহ নাম, সিদ্দীক ও আতিক উপাধী, ডাকনাম বা কুনিয়াত আবুবকর, পিতার নাম ওসমান, কুনিয়াত আবু কুহাফা, মাতার নাম নাস সালমা এবং কুনিয়াত উম্মুল খায়ের। কুরাইশ বংশের উপর দিকে ষষ্ঠ পুরুষ ‘মুররা’তে গিয়ে রাসুলাল্লাহ (সা) এর নসবের সাথে তাঁর নসব মিলিত হয়েছে। রাসুলাল্লাহ (সা) এর জন্মের দু’বছরের কিছু বেশী সময় পর তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং অনুরুপ সময়ের ব্যবধানে তাঁরা উভয়ে ইন্তেকাল করেন। তাই মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল রাসুলাল্লাহ (সা) এর বয়সের সমান।

তিনি ছিলেন উজ্জল গৌরবর্ণ, পাতলা ছিপছিপে ও প্রশস্ত ললাট বিশিষ্ট। শেষ বয়সে চুল সাদা হয়ে গিয়েছিল। মেহেদীর খিজাব লাগাতেন। অত্যন্ত দয়ালু ও সহনশীল ছিলেন।

তিনি ছিলেন সম্মানীত কুরাইশদের অন্যতম। জ্ঞান, মেধা, অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি, বিচক্ষনতা ও সচ্চরিত্রতার জন্য আপামর মক্কাবাসীর শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। জাহেলী যুগে মক্কাবাসীদের ‘দিয়াত’ বা রক্তের ক্ষতিপুরণের সমুদয় অর্থ তাঁর কাছে জমা হতো। আরব বাসীর নসব বা বংশ সংক্রান্ত জ্ঞানে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ। কাব্য প্রতিভাও ছিল। অত্যন্ত বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল- ভাষী ছিলেন। বক্তৃতা ও বাগ্মীতায় খোদা প্রদত্ত যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন।

তিনি ছিলেন তাঁর গোত্রের অত্যন্ত জনপ্রিয়, বন্ধুবৎসল ও অমায়িক ব্যক্তি। তিনি ছিলেন ব্যবসায়ী, দানশীল ও চরিত্রবান। জাহেলী যুগেও কখনো শরাব পান করেননি। তারঁ অমায়িক মেলামেশা, পান্ডিত্য ও ব্যবসায়িক দক্ষতার কারণে অনেকেই তাঁর সাথে বন্ধুত্য ও সখ্যতা স্থাপন করতো। তাঁর বাড়িতে প্রতিদিনই মক্কার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিয়মিত বৈঠক বসতো।

হযরত আবু বকরের পিতা আবু কুহাফা কুরাইশদের মধ্যে যথেষ্ট মর্যাদাবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন বয়োবৃদ্ধ ও স্বচ্ছল। তাঁর গৃহ কেবল ব্যবসা বাণিজ্যের জন্যই প্রসিদ্ধ ছিলনা, সামাজিক কর্মকান্ডেও তাঁর মতামত অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করা হতো। মক্কা বিজয় পর্যন্ত ইসলামের প্রতি তিনি আকৃষ্ট না হলেও পুত্র আবু বকরকে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে রেখেছেন- এমন কোন প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। অবশ্য হযরত আলীকে (রা) তিনি দেখলে মাঝে মাঝে বলতেন 'এই ছোকড়াই আমার ছেলেটার মাথা বিগড়ে দিয়েছে'। মক্কা বিজয়ের দিন রাসুলাল্লাহ (সা)'র খেদমতে হাজির হয়ে ইসলামের ঘোষনা দেন। হিজরী ১৪ সনে একশ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। শেষ বয়সে তিনি দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন।

হযরত আবু বকরের মা'উম্মুল খায়ের' স্বামীর বহু পুর্বে মক্কায় ইসলামের প্রথম পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। মক্কার 'দারুল আরকামে' ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে তিনি অন্যতম। স্বামীর মত তিনিও দীর্ঘ জীবন লাভ করেন। প্রায় ৯০ বছর বয়সে পুত্রকে খেলাফতের পদে অধিষ্টিত রেখে তিনি ইন্তেকাল করেন।

আবু বকর ছিলেন পিতার একমাত্র পুত্র সন্তান। অত্যন্ত আদর যত্ন ও বিলাসিতার মাঝে পালিত হন তিনি। শৈশব থেকে যৌবনের সূচনা পর্যন্ত পিতার উপর নির্ভরশীল ছিলেন। বিশ বছর বয়সে পিতার ব্যবসা বানিজ্যের দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নেন।

শৈশব থেকে আবু বকরের সাথে রাসুলাল্লাহ (সা)'র বন্ধুত্য ছিল। তিনি রাসুলাল্লাহ (সা)'র অধিকাংশ বাণিজ্য সফরের সফর সঙ্গী ছিলেন। একবার রাসুলাল্লাহ (সা)'র সঙ্গে ব্যবসা উপলক্ষে সিরিয়া যান। তখন তাঁর বয়স প্রায় আঠার আর হুজুর (সা) এর বয়স বিশ। তাঁরা যখন সিরিয়া সীমান্তে; বিশ্রামের জন্য রাসুলাল্লাহ (সা)'র একটি গাছের নীচে বসেন। আবু বকর একটু সামনে এগিয়ে এদিক ওদিক দেখতে লাগলেন। এক খ্রীষ্টান পাদ্রীর সাথে তাঁর দেখা হয় এবং ধর্ম বিষয়ে কিছু কথা- বার্তা হয়। আলাপের মাঝখানে পাদ্রী জিজ্ঞেস করে ওখানে গাছের নীচে কে ? আবু বকর বললেন, এক কুরাইশ যুবক, নাম মুহাম্মাদ বিন আবদিল্লাহ। পাদ্রী বলে উঠল, এ ব্যক্তি আরবদের নবী হবেন। কথাটি আবু বকরের অন্তরে গেঁথে যায়। তখন থেকেই তার অন্তরে রাসুলাল্লাহ (সা)'র নবী হওয়া সম্পর্কে দৃঢ় প্রত্যয় হতে থাকে। ইতিহাসে এ পাদ্রীর নাম 'বুহাইরা' বা' নাসতুরা' বলে উল্লেখিত হয়েছে।

রাসুলাল্লাহ (সা)'র নবুয়ত লাভের ঘোষনায় মক্কায় হৈ চৈ পরে গেল। মক্কার প্রভাবশালী ধনি নেতৃবৃন্দ তাঁর বিরোধিতায় কোমর বেঁধে লেগে যায়। কেউবা রাসুলাল্লাহ (সা)'কে মাথা খারাপ, কেউবা জীনে ধরা বলতে থাকে। নেতৃবৃন্দের ইংগিতে ও তাদের দেখা- দেখি সাধারন লোকেরাও ইসলাম থেকে দুরে সরে থাকে। কুরাইশদের ধনবান ও সম্মানী ব্যক্তিদের মধ্যে এক মাত্র আবু বকর রাসুলাল্লাহ (সা)'র সঙ্গ দেন, তাঁকে সাহস দেন এবং বিনা দ্বিধায় তাঁর নবুয়তের প্রতি ঈমান আনেন। এই প্রসঙ্গে রাসুলাল্লাহ (সা)

বলেছেনঃ আমি যাকেই ইসলামের দাওয়াত দিয়েছি, একমাত্র আবু বকর ছাড়া প্রত্যেকের মধ্যেই কিছু না কিছু দ্বিধার ভাব লক্ষ্য করেছি। এভাবে আবু বকর হলেন বয়স্ক আজাদ লোকদের মধ্যে প্রথম মুসলমান।

মুসলমান হওয়ার পর ইসলামের ভিত্তি সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে তিনি রাসুলাল্লাহ (সা)'র সাথে দাওয়াতী কাজে আত্মনিয়োগ করেন। মক্কার আশপাশের গোত্র সমুহে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। হজ্জের মৌসুমে বিভিন্ন তাঁবুতে গিয়ে লোকদের দাওয়াত দিতেন। বহিরাগত লোকদের কাছে ইসলামের ও রাসুলাল্লাহ (সা)'র পরিচয় তুলে ধরতেন। এভাবে আরববাসী রাসুলাল্লাহ (সা)'র প্রচারিত দ্বীন সম্পর্কে অবহিত হয়ে তাঁর উপর ঈমান আনে। তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাব ও চেষ্টায় তৎকালীন কুরাইশ বংশের বিশিষ্ট যুবক উসমান, যুবায়ের, আব্দুর রহমান, সা'দ ও তালহার মত ব্যক্তিরা সহ আরো অনেকে ইসলাম গ্রহণ করেন।

রাসুলাল্লাহ (সা) যখন নবুওয়াতের প্রকাশ্য ঘোষনা দিলেন, আবু বকরের নিকট তখন চল্লিশ হাজার দিরহাম। ইসলামের জন্য তিনি তাঁর সকল সম্পদ ওয়াকফ করে দেন। কুরাইশদের যেসব দাস- দাসী ইসলাম গ্রহনের কারনে নিগৃহীত ও নির্যাতিত হচ্ছিল, এ অর্থ দ্বারা তিনি সেই সব দাস- দাসী খরিদ করে আযাদ করেন। তেরো বছর পর যখন রাসুলাল্লাহ (সা) সাথে তিনি মদীনায় হিজরাত করেন তাঁর কাছে এ অর্থের মাত্র আড়াই হাজার দেরহাম অবশিষ্ট ছিল। অল্পদিনের মধ্যে অবশিষ্ট দিরহাম গুলিও ইসলামের জন্য ব্যয়িত হয়। বিলাল,খাব্বাব,আম্মার,আম্মারের মা সুমাইয়্যা,সুহাইব,আবু ফুকাইহ প্রমুখ দাস- দাসী তাঁরই অর্থের বিনিময়ে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি লাভ করেন। তাই পরবর্তী কালে রাসুলাল্লাহ (সা) বলেছেনঃ আমি প্রতিটি মানুষের ইহসান পরিশোধ করেছি। কিন্তু আবু বকরের ইহসান সমূহ এমন যে, পরিশোধ করতে আমি অক্ষম। তাঁর প্রতিদান আল্লাহ দেবেন। তাঁর অর্থ আমার উপকারে যেমন এসেছে, অন্য কারো অর্থ তেমন আসেনি।

রাসুলাল্লাহ (সা) মুখে মি'রাজের কথা অনেকেই যখন বিশ্বাস- অবিশ্বাসের মাঝখানে দোল খাচ্ছিল,তখন তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। হযরত হাসান (রা) বলেনঃ মি'রাজের কথা বহু সংখ্যক মুসলমান ইসলাম ত্যাগ করে। লোকে আবু বকরের কাছে গিয়ে বলেঃ আবু বকর তোমার বন্ধুকে তুমি বিশ্বাস কর? সে বলেছে, সে নাকি গতরাতে বাইতুল মাকদাসে গিয়েছে, সেখানে সে নামায পড়েছে, অতঃপর মক্কায় ফিরে এসেছে।

আবু বকর বললেনঃ তোমরা কি তাঁকে বিশ্বাস কর? তারা বললঃ হ্যাঁ, ঐতো মসজিদে বসে লোকজনকে এ কথাই বলেছে। আবু বকর বললেনঃ আল্লাহর কসম, তিনি যদি এ কথাই বলে থাকেন তাহলে সত্য কথাই বলেছেন। এতে অবাক হাওয়ার কি দেখলে? তিনি তো আমাকে বলে থাকেন,তাঁর কাছে আল্লাহর কাজ থেকে ওহী আসে। আকাশ থেকে ওহী আসে মাত্র এক মুহূর্তের মধ্যে। তাঁর সে কথাও আমি বিশ্বাস করি। তোমার যে ঘটনায় বিস্ময় প্রকাশ করেছো এটা তাঁর চেয়েও বিস্ময়কর। তারপর তিনি রাসুলাল্লাহ (সা) কাছে গিয়ে হাজির হলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ হে আল্লাহর নবী, আপনি কি জনগনকে বলেছেন যে, আপনি গত রাতে বাইতুল মাকদাস ভ্রমন করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আবু বকর বললেনঃ আপনি

ঠিকই বলেছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি নিঃসন্দেহে আল্লাহর রাসূল। রাসুলাল্লাহ (সা) বললেলঃ হে আবু বকর, তুমি সিদ্দিক। এভাবে আবু বকর "সিদ্দিক" উপাধিতে ভুষিত হন।

মক্কায় রাসুলাল্লাহ (সা) অভ্যাস ছিল সকাল সন্ধায় আবু বকরের বাড়ীতে গমন করা। কোন বিষয়ে পরামর্শের প্রয়োজন হলে তাঁর পরার্মশ করা। রাসূল (স) দাওয়াত ও তাবলীগের উদ্দেশ্য কোথাও গেলে তিনিও সাধারনত সঙ্গে থাকতেন।

মুসলমানের ওপর মুশরিকদের অত্যাচার চরম আকারে ধারন করলে একবার তিনি হাবশায় হিজরাত করার ইচ্ছা করেছিলেন কিন্তু "ইবনুদ দাগনাহ" নামক গোত্রপতি তাঁকে এ সিদ্ধান্ত থেকে বিরত রাখে। সে কুরাইশদের হাত থেকে এ শর্তে নিরাপত্তা দেয় যে,আবু বকর প্রকাশ্য সালাত আদায় করবেন না, কিন্তু দীর্ঘদিন এ শর্ত পালন করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তিনি ইবনুদ দাগনাহ নিরাপত্তা ফিরেয়ে দেন এবং অনান্য মুসলমান ভাইদের যে অবস্থা হয় সন্তুষ্টচিত্তে তা গ্রহনের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান ।

রাসুলাল্লাহ (সা) হিজরাতের সেই কঠিন মুহূর্তে আবু বকরের কোরবানী, বুদ্ধিমত্তা, ধৈর্য্য ও বন্ধুত্বের কথা ইতিহাসের চিরদির অম্লান হয়ে থাকবে। তাঁর সাহচর্য়ের কথা তো পবিত্র কোরআনে স্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছে। ইবনে ইসহাক বলেন "আবু বকর রাসুলাল্লাহর (সা) কাজে হিজরতের অনুমতি চাইলে রাসুলাল্লাহ (সা) তাঁকে বলতেনঃ তুমি তাড়াহুড়া করোনা। আল্লাহ হয়তো তোমাকে একজন সহযাত্রী জুটিয়ে দেবেন। আবু বকর একথা শুনে ভাবতেন যে, রাসুলাল্লাহ (সা) হয়তো নিজের একথাই বলেছেন। তাই তিনি তখন থেকেই দুটো উট কিনে অত্যন্ত যত্ন সহকারে পুষতে থাকতেন। এই আশায় যে, হিজরাতের সময় হয়তো কাজে লাগতে পারে"।

উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেনঃ রাসুলাল্লাহ (সা) দিনে অন্তত একবার আবু বকরের বাড়িতে আসতেন। যেদিন হিজরতের অনুমতি পেলেন সেদিন দুপুরে আমাদের বাড়িতে আসলেন, এমন সময় কখনো তিনি আসতেন না। তাঁকে দেখামাত্র আবু বকর বলে উঠলেন, নিশ্চয় কিছু একটা ঘটেছে। তা না হলে এমন সময় রাসুলাল্লাহ (সা) আসতেন না। তিনি বাড়ীতে প্রবেশ করলে আবু বকর খাটের একধারে সরে বসলেন। আবু বকরের বাড়ীতে তখন আমি ও আমার বোন আসমা ছাড়া আর কেউ ছিল না। রাসুলাল্লাহ (সা) বললেনঃ তোমার এখানে অন্য যারা আছে, তাদেরকে আমার কাছ হতে দুরে সরিয়ে দাও। আবু বকর বললেন হে আল্লাহর রাসুল আমার দুই মেয়ে ছাড়া আর কেউ নেই। আপনার কি হয়েছে ? রাসুলাল্লাহ (সা) বললেন, আল্লাহ আমাকে হিজরত করার অনুমতি দিয়েছেন। আবু বরক জিজ্ঞেস করলেন আমিও কি সঙ্গে যেতে পারব ? রাসুলাল্লাহ (সা) বললেনঃ হ্যাঁ যেতে পারবে। আয়েশা বলেনঃ সেদিনের আগে আমি জানতাম না যে, মানুষ আনন্দের আতিশয্যেও এত কাঁদতে পারে। আমি আবু বকরকে সেদিন কাঁদতে দেখেছি। অতঃপর আবু বকর (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসুল ! এই দেখুন আমি এই উট দুটো এ কাজের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি।

তাঁরা আব্দুল্লাহ ইবন উরায়তকে পথ দেখিয়ে পথ দেখিয়ে নেয়ার জন্য ভাড়া করে সাথে নিলেন। সে ছিল মুশরিক, তবে বিশ্বাষভাজন। রাতের আঁধারে তাঁলা আবু বকরের বাড়ির পিছন দরজা দিয়ে বের হলেন এবং নিম্ন ভুমিতে "সাওর" পর্বতের একটি গুহায় আশ্রয় নিলেন। হাসান বসরী (রা) ইবন হিশাম হতে বর্ণনা করেনঃ তাঁরা রাতে 'সাওর' পর্বতের গুহায় পৌছেন। রাসুলাল্লাহ (সা),র প্রবেশের আগে আবু বকর (রা) গুহায় প্রবেশ করলেন। সেখানে কোন হিংস্র প্রানী বা সাপ- বিচ্ছু আছে কিনা তা দেখে নিলেন। রাসুলাল্লাহ (সা) কে বিপদমুক্ত রাখার উদ্দশ্যেই তিনি এরুপ ঝুঁকি নিয়েছিলেন।

মক্কায় উম্মুল মোমেনীন হযরত খাদিজার ওফাতের পর রাসুলাল্লাহ (সা) কে যখন আবু বকর (রা) বিমর্ষ দেখলেন, অত্যন্ত আদব ও নিষ্ঠার সাথে নিজের অল্প বয়স্কা কন্যা আয়েশাকে (রা) রাসুলাল্লাহ (সা),র সাথে বিয়ে দেন। মোহরের অর্থও নিজেই পরিশোধ করেন।

হিজরতের পর সকল অভিয়ানেই তিনি রাসুলাল্লাহ (সা),র সাথে অংশগ্রহণ করেন, কোন একটি অভিযানেও অংশগ্রহণ হতে বঞ্চিত হননি।

তাবুক অভিযানে তিনি ছিলেন মুসলিম বাহিনীর পতাকাবাহী।এ অভিযানের সময় রাসুলাল্লাহ (সা),র এর আহবানে সাড়া দিয়ে বাড়িতে যা কিছু অর্থ- সম্পদ ছিল সবই তিনি রাসুলাল্লাহ (সা),র হাতে তুলে দেন। আল্লাহ'র রাসুল জিজ্ঞেস করলেনঃ হে আবু বকর ছেলে মেয়েদের জন্য বাড়িতে কিছু রেখেছো কি ? জবাবে আবু বকর বললেনঃ তাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই যথেষ্ট।

মক্কা বিজয়ের পর নবম হিজরীতে প্রথম ইসলামি হজ্জ আদায় উপলক্ষে রাসুলাল্লাহ (সা) আবু বকরকে (রা) "আমিরুল হাজ্ব" নিয়োগ করেন। রাসুলাল্লাহ (সা),র অন্তিম রোগ শয্যায় তাঁরই নির্দেশে মসজিদে নববীর ইমামতীর দায়িত্ব পালন করেন। মোট কথা রাসুলাল্লাহ (সা),র জীবদ্দশায় আবু বকর তাঁর উজির ও উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেন।

রাসুলাল্লাহ (সা),র ওফাতের পর আবু বকর লা) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। "খলিফাতু রাসুলিল্লাহ"- এ উপাধিটি কেবল তাঁকেই দেয়া হয়। পরবর্তী খলিফাদের 'আমিরুল মোমেনীন' উপাধি দেয়া হয়েছে।

ব্যবসা ছিল তাঁর পেশা। ইসলাম- পুর্ব যুগে কুরাইশদের এক ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ছিলেন। ইসলাম গ্রহনের পরেও জীবিকার তাগিদে এ পেশা চালিয়ে যেতে থাকেন। তবে খলিফা হবার পর খিলাফতের গুরু দায়িত্ব কাঁধে পরায় ব্যবসার পাট চুকাতে বাধ্য হন। হযরত উমর ও আবু উবাইদার পীড়াপিড়িতে মজলিশে সুরার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রয়োজন অনুপাতে বাইতুল মাল হতে নুন্যতম ভাতা গ্রহনে স্বীকৃত হন। যার পরিমাণ ছিল বাৎসরিক আড়াই হাজার দিরহাম। তবে মৃত্যুর পুর্বে তাঁর স্থাবর- অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে বাইতুল মাল হতে গৃহিত সমুদয় অর্থ ফেরত দানের নির্দেশ দিয়ে যান।

রাসুলাল্লাহ (সা),র ওফাতের সংবাদে সাহাবা মন্ডলি যখন সর্ম্পূন হতভম্ব, তাঁরা যখন চিন্তাই করতে পারছিলেন না, রাসুলাল্লাহ (সা)'র ওফাত হতে পারে, এমনকি হযরত "উমর (রা) কোষমুক্ত তরবারি হাতে নিয়ে ঘোষনা করে বসেন- যে বলবে রাসুলাল্লাহ (সা)'র হয়েছে তাঁকে হত্যা করবো"। এমনই এক ভাব- বিহবল পরিবেশেও আবু বকর (রা) ছিলেন অত্যন্ত দৃঢ় ও অবিচল। সমবেত জনতাকে লক্ষ্য করে তিনি ঘোষনা করেনঃ "যারা মুহাম্মাদের ইবাদত করতে তারা জেনে রাখ, মুহাম্মাদ মৃত্যবরণ করেছেন। কিন্তু যারা আল্লাহর ইবাদত কর তারা জেনে রাখ আল্লাহ চিরঞ্জীব- তাঁর মৃত্যু নেই"। তারপর এ আয়াত পাঠ করেনঃ মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল ছাড়া আর কিছু নন। তাঁর পূর্বে বহু রাসূল অতিবাহিত হয়েছে। তিনি যদি মারা যান বা নিহিত হন তাহলে তোমরা কি পেছনে ফিরে যাবে? যারা পেছনে ফিরে যাবে তারা আল্লাহর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। যারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে শিগগিরই আল্লাহ তাদের প্রতিদান দেবেন"। (সূরা আলে ইমরান- ১৪৪) আবু বকরের মুখে এ আয়াত শুনার সাথে সাথে লোকেরা যেন সম্বিত ফিরে পেল। তাদের কাছে মনে হল এ আয়াত যেন তারা এই প্রথম শুনছে। এভাবে রাসুলাল্লাহ (সা),র ইনতিকালের সাথে সাথে প্রথম যে মারাত্নক সমস্যাটি দেখা দেয়, আবু বকরের (রা) দৃঢ় হস্তক্ষেপে তার পরিসমাপ্তি ঘটে।

রাসুলাল্লাহ (সা),র কাফন- দাফন তখনো সম্পন্ন হতে পারেনি। এরই মধ্যে তাঁর স্থলাভিষিক্তির বিষয়টি জটিল আকার ধারন করলো। মদীনায় জনগন, বিশেষগত আনসাররা "সাকীফা বনী সায়েদা" নামক স্থানে সমবেত হলো। আনসাররা দাবী করলো, যেহেতু আমরা রাসুলাল্লাহ (সা) কে আশ্রয় দিয়েছি, নিজেদের জান- মালের বিনিময়ে দুর্বল ইসলামকে সবল ও শক্তিশালী করেছি, আমাদের মধ্য থেকে কাউকে রাসুলাল্লাহ (সা),র স্থলাভিষিক্ত করতে হবে। মুজাহিরদের কাছে এ দাবী গ্রহনযোগ্য হলো না। তারা বললোঃ ইসলামের বীজ আমরা বপন করেছি এবং আমরাই তাতে পানি সিঞ্চন করেছি। সুতারাং আমরাই খিলাফতের অধিকতর হকদার। পরিস্থিতি ভিন্নদিকে মোড় নিল। আবু বকরকে (রা) ডাকা হল। তিনি তখন রাসুলাল্লাহ (সা),র পবিত্র মরদেহের নিকট। তিনি তখন উপস্থিত হয়ে ধীর- স্থিরভাবে কথা বললেন। তাঁর যুক্তি ও প্রমাণের কাছে আনসাররা নতি স্বীকার করলো। এভাবে রাসুলাল্লাহ (সা),র ইনতিকালের পর দ্বিতীয় সমস্যাটি দেখা দেয়, আবু বকরের (রা) বুদ্ধি ও বিচক্ষণতায় তারও সুন্দর সমাধান হয়ে যায়।

আবু বকর খলীফা নির্বাচিত হলেন। খলীফা হওয়ার পর সমবেত মুহাজির ও আনসারদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেনঃ "আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আমাকে খলীফা বানানো হয়েছে। আল্লাহর কসম, আমি চাচ্ছিলাম, আপনাদের মধ্য থেকে অন্য কেউ এ দ্বায়িত্ব গ্রহন করুক। আমি স্বরণ করিয়ে দিতে চাই, আপনারা যদি চান আমার আচরণ রাসুলাল্লাহ (সা),র আচরনের মত হোক, তাহলে আমাকে সেই পর্য়ায়ে পোঁছার ব্যাপারে অক্ষম মনে করবেন। তিনি ছিলেন নবী। ভুলক্রতি থেকে ছিলেন পবিত্র। তাঁর মত আমার কোন বিশেষ মর্যদা নেই। আমি একজন সাধারন মানুষ। আপনাদের কোন একজন সাধারন ব্যক্তি থেকেও উত্তম হওয়ার দাবী আমি করতে পারিনে।.....আপনারা যদি দেখেন আমি সঠিক কাজ করছি, আমার সহায়তা করবেন। যদি দেখেন আমি বিপদগামী যচ্ছি, আমাকে সর্তক করে দেবেন। তাঁর

সেই নীতি নির্ধারিত সংক্ষিপ্ত প্রথম ভাষনটি চিরকাল বিশ্বের সকল রাষ্ট্র নায়কদে র জন্য অনুকরনীয় হয়ে থাকবে।

তাঁর চরিত্রের সীমাহীন দৃঢ়তার আর এক প্রকাশ ঘটে রাসুলাল্লাহ (সা),র ইনতিকালের অব্যবহিত পরে উসামা ইবনে যায়িদের বাহিনীকে পাঠানোর মাধ্যমে। রাসুলাল্লাহ (সা),র ওফাতের অল্প কিছুদিন আগে মুতা অভিযানে শাহাদাত প্রাপ্ত যায়িদ ইবনে হারিসা, জাফর ইবনে আবি তালিব ও আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার (রা) রক্তের পরিশোধ নেয়ার জন্য একটি বাহিনী প্রস্তুত করেন। এ বাহিনীর কমান্ডার নিযুক্ত করেন নওজোয়ান উসামা ইবন যায়িদকে। রাসুলাল্লাহ (সা),র নির্দেশে উসামা তাঁর বাহিনীসহ সিরিয়ার দিকে রওয়ানা হলেন। তাঁরা মদীনা থেকে বের হতেই রাসুলাল্লাহ (সা) অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁরা মদীনার উপকন্ঠে শিবির স্থাপন করে রাসুলাল্লাহ (সা)'র রোগমুক্তির প্রতিক্ষা করতে থাকেন। কিন্তু এ রোগেই রাসূল (সা) ইনতিকাল করেন। আবু বকর (রা) খলীফা হলেন। এদিকে রাসুলাল্লাহ (সা) ওফাতের সংবাদে আবর উপদ্বীপের বিভিন্ন দিকে নানা অপশক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। কেউ বা ইসলাম ত্যাগ করে, কেউ বা যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায়, কেউ বা নুবওয়াত দাবী করে বসে। এমনি এক চরম অবস্থায় অনেকে পরামর্শ দিলেন উসামার বাহিনী পাঠানোর ব্যাপারটি স্থগিত রাখতে। কিন্ত আবু বকর অত্যন্ত কঠোর ভাবে এ প্রস্তাব প্রত্যাখান করলেন। তিনি যদি এ বাহিনী পাঠাতে ইতস্ত করতেন বা কাল বিলম্ব করতেন তাহলে খিলাফতের দায়িত্ব লাভের পর এটা হতো রাসুলাল্লাহ (সা),র নির্দেশের প্রথম বিরুদ্ধাচরণ। কারণ অন্তিআম রোগ শয্যায় তিনি উসামা বাহিনীকে যাত্রার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

আবু বকর উসামার বাহিনী পাঠানোর সিদ্ধান্ত অটল থাকেন। তখন আনসারদের একটি দল দাবী করলেন; তাহলে অন্তত উসামাকে কমান্ডারের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে অন্য কোন বয়স্ক সাহাবীকে তাঁর স্থলে নিয়োগ করা হউক। উল্লেখ্য যে তখন উসামার বয়স মাত্র বিশ বছর। সকলের পক্ষ হতে প্রস্তাবটি হযরত উমার উপস্থাপন করলেন। প্রস্তাব শুনে আবু বকর রাগে ফেটে পরলেন। তিনি উমারের দাড়ি মুট করে ধরে বললেনঃ রাসুলাল্লাহ (সা) যাকে নিয়োগ করেছেন, আবু বকর তাকে অপসারন করবে ? এভাবে এ প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখান করেন।

হযরত উমারও ছিলেন উসামার এ বাহিনীর অর্ন্তভুক্ত একজন সৈনিক। অথচ নতুন খলিফার জন্য তখন তাঁর মদিনায় থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। খলিফা ইচ্ছে করলে তাঁকে নিজেই মদীনায় থেকে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিতে পারতেন। কিন্ত তিনি উসামার ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ না করে তাঁর কাছে আবেদন জানালেন উমারকে মদীনায় রেখে যাওয়ার জন্য। উসামা খলিফার আবেদন মঞ্জুর করলেন। কারণ আবু বকর (রা) বুঝেছিলেন, উসামার নিয়োগ কর্তা খোদ রাসুলাল্লাহ (সা)। সুতরাং এক্ষেত্রে উসামার ক্ষমতা তাঁর ক্ষমতার উপরে। এভাবে আবু বকর (রা) রাসুলাল্লাহ (সা),র এর আদেশ যথাযথ বাস্তবায়ন করেন এবং তাঁর সামান্যতম বিরুদ্ধাচারন থেকেও বিরত থাকেন।

রাসুলাল্লাহ (সা),র ইন্তিকালের পর আবাস ও জুবইয়ান গোত্রদ্বয় যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায়। বিষয়টি নিয়ে খলিফার দরবারে পরামর্শ হয়। সাহাবীদের অনেকেই তাদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান না চালানোর পরামর্শ দেন। কিন্ত আবু বকর (রা) অটল। তিনি বললেনঃ আল্লাহর কসম, রাসুলাল্লাহ (সা),র যুগে উটের যে বাচ্চাটি যাকাত পাঠানো হতো এখন যদি তা কেউ দিতে অসীকৃতি করে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করব।

কিছু লোক নবুয়তের মিথ্যা দাবীদার ছিল। আবু বকর (রা) অসীম সাহস ও দৃঢ়তার সহকারে এসব ভন্ড নবীর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে ইসলামের বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেন। তাই ইতিহাসবিদরা মন্তব্য করেছেনঃ আল্লাহর সাহায্য ও সহায়তার পর আবু বকরের এ দৃঢ়তা যদি না হতো, মুসলিম জাতির ইতিহাস হয়তো অন্যভাবে লিখা হতো।

এমনটি সম্ভব হয়েছে এই জন্য যে, হযরত আবু বকরের (রা) স্বভাবের দু'টি পরস্পরবিরোধী গুনের সমাবেশ ঘটেছিল, সীমাহীন দৃঢ়তা ও কোমলতা। এ কারণে তাঁর চরিত্রে সর্বদা একটা ভারসাম্য বিরাজমান ছিল। কোন ব্যক্তির স্বভাবে যদি এ দু'টি গুনের কেবল একটি বর্তমান থাকে এবং অন্যটি থাকে অনুপস্থিত, তখন তাঁর চরিত্রের ভারসাম্য বিনষ্ট হবার সমূহ সম্ভাবনা থাকে । কিন্ত আল্লাহর অনুগ্রহে এ দু'টি গুন তাঁর চরিত্রে সমানভাবে বিদ্যমান ছিল। হযরত আবু বকর যদিও মুসলমানদের নেতা ও খলিফা ছিলেন, তবুও তাঁর জীবন ছিল অনাড়াম্বর। খলিফা হওয়া সত্তেও মদীনার অলিগলিতে ঘুরে ঘুরে জনগণের অবস্থা জানতেন, এবং তাদের ব্যক্তিগত কাজও সময় সময় নিজ হাতে করে দিতেন। হযরত উমার (রা) বলেনঃ আমি প্রতিদিন সকালে এক বৃদ্ধার বাড়িতে তার ঘরের কাজ করে দিতাম। প্রতিদিনের মত একদিন তার বাড়িতে উপস্থিত হলে বৃদ্ধা বললেনঃ আজ কোন কাজ নেই। এক নেককার ব্যক্তি তোমার আগেই কাজ গুলো শেষ করে গেছে। হযরত উমার পরে জানতে পারেন সেই নেককার ব্যক্তিটি হযরত আবু বকর (রা) । খলিফা হওয়া সত্তেও এভাবে এক অনাথ বুদ্ধার কাজ করে দিয়ে যেতেন। হযরত আবু বকর মাত্র আড়াই বছরের মত খেলাফত পরিচালনা করেন। তবে তাঁর এ সময়টুকু ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ বলে বিবেচিত হয়। রাসুলাল্লাহ (সা)'র ইন্তিকালের পর তাঁর সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য অবদান হলো, মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখা। আরবের বিদ্রোহ সমূহ নির্মুল করা। রাষ্ট্র ও সরকারকে তিনি এত মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন যে, মুসলমানরা ইরান ও রোমের মত দুই পরাশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করতে সাহসী হয় ও অল্প সময়ের মধ্যে তাদের বহু অঞ্চল দখল করে নেয়।

হযরত আবু বকরের আরেকটি অবদান পবিত্র কোরআনের সংকলন ও সংরক্ষন। তাঁর খিলাফত কালের প্রথম অধ্যায়ে আরবের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ দেখা দেয়। সেই সব বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে কয়েকশত হাফেজে কোরআন শাহাদাত বরন করেন। শুধু মাত্র মুসায়লামা কাজ্জাবের সাথে যে যুদ্ধ হয় তাতেই সাত শ' হাফেজ শহীদ হন। অতঃপর হযরত উমারের পরামর্শে হযরত আবু বকর (রা) সম্পুর্ণ কোরআন

একস্থানে গ্রন্থাকারে সংকলন করেন এবং কপিটি নিজের কাছে সংরক্ষন করেন। ইতিহাসে কোরআনের এই আদি কপিটি 'মাসহাফে সিদ্দিকী' নামে পরিচিত। পরবর্তী কালে হযরত ওসমানের যুগে কোরআনের যে কপিগুলো করা হয় তা 'মাসহাফে সিদ্দিকী'র অনুলিপি মাত্র।

হযরত আবু বকর রাসুলাল্লাহ (সা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, আল্লামা জাহাবী 'তাজকিরাতুল হুফফাজ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সতর্ক। অত্যধিক সতর্কতার কারণে তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা অন্যদের তুলনায় অনেক কম। উমার, উসমান, আব্দুর রহমান ইবন আউফ, ইবন মাসউদ, ইবন উমার, ইবন আ'মার, ইবন আব্বাস, হুজাইফা, যায়িদ ইবন সাবিদ, উকবা, মা'কাল, আনাস, আবু হুরাইরা, আবু উমামা, আবু বারাযা, আবু মুসা, তাঁর দু কন্যা আয়েশা ও আসমা প্রমুখ সাহাবী তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। বিশিষ্ট তাঁবেয়ীরাও তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১৩ই হিজরীর ৭ই জমাদিউল উখরা হযরত আবু বকর (রা) জ্বরে আক্রান্ত হন। ১৫দিন রোগাক্রান্ত থাকার পর হিজরী ১৩ সনের ২১শে জমাদিউল উখরা মোতাবেক ৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ইন্তেকাল করেন। হযরত আয়েশার (রা) হুজরায় রাসুলাল্লাহ (সা)'র পাশের একটু পুবদিকে তাঁকে দাফন করা হয়। তিনি দু'বছর তিনমাস দশদিন খেলাফতের দায়িত্ব পালন করেন।

প্রচেষ্টা
একটি ইসলামিক শিক্ষার ওয়েবসাইট

http://www.eliasahmed.com/

হযরত উমর (রা)

নাম' উমর, লকব ফারুক এবং কুনিয়াত আবু হাফস। পিতা খাত্তাব ও মাতা হানতামা। কুরাইশ বংশের আ'দী গোত্রের লোক। উমরের অষ্টম অর্ধ পুরুষ কা'ব নামক ব্যক্তির মাধ্যমে রাসূলুল্লাহর (সা) নসবের সাথে তাঁর নসব মিলিত হয়েছে। পিতা খাত্তাব কুরাইশের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। মাতা "হানতামা" কুরাইশ বংশের বিখ্যাত সেনাপতি হিশাব ইবনে মুগীরার কন্যা। ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনাপতি খালেদ বিন ওয়ালিদ এই মুগীরার পৌত্র। মক্কার জাবালে আকিব এর পাদদেশে ছিল জাহিলী যুগে বনী আ'দী ইবনে কা'বের বসতি। এখানই ছিল হযরত উমরের বাসস্থান। ইসলামী যুগে "উমরের নাম অনুসারে পাহাড়টির নাম হয় "জাবালে উমর"- উমরের পাহাড়। (তাবাকাতে ইবনে সা'দ ৩/৬৬) উমারের চাচাত ভাই, যায়দি বিন নুফাইল। হযরত রাসূলে কারীমের আবির্ভাবের পূর্বে নিজের বিচার- বুদ্ধি সাহয্যে মুর্তিপূজা ত্যাগ করে জাহিলী আরবে যাঁরা তাওহীদবাদী হয়েছিলেন, যায়িদ তাঁদেরই একজন।

রাসূলুল্লাহর (সা) জন্মের তেরো বছর পর তাঁর জন্ম। মৃত্যকালেও তাঁর বয়স হয়েছিল রাসূলুল্লাহর (সা) বয়সের সমান ৬৩ বছর। তবে তাঁর জন্ম ও ইসলাম গ্রহণের সন সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতাভেদ রয়েছে।

গায়েন রং উজ্জল গৌরবর্ণ,টাক মাথা, গন্ডদেশ মাংসহীন, ঘন দাড়ি, মোঁচের দু'পাশ লম্বা ও পুরু এবং শরীর দীর্ঘাকৃতির। হাজার মানুষের মধ্যেও তাঁকেই সবার থেকে লম্বা দেখা যেত।

তাঁর জন্ম ও বাল্যকাল সমন্ধে তেমন কিছু জানা যায় না। ইবনে আসাকির তাঁর তারিখে "আমর আবনে আস (রা) হতে একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। তাতে জানা যায়, একদিন আমর ইবন আ'স বন্ধু-বান্ধবসহ বসে আছেন, এমন সময় হৈ চৈ শুনতে পেলেন। সংবাদ নিয়ে জানতে পেলেন, খাত্তাবের একটি ছেলে হয়েছে। এ বর্ণনার ভিত্তিতে মনে হয়, হযরত উমরের জন্মের সময় বেশ আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

তাঁর যৌবনের অবস্থাও প্রায় অনেকটা অজ্ঞাত। কে জানত যে এই সাধারন একরোখা ধরনের যুবকটি একদিন 'ফারুকে আযমে' পরিণত হবেন। কৈশোরে উমরের পিতা তাঁকে উটের রাখালী কাজে লাগিয়ে দেন। তিনি মক্কার নিকটবর্তী 'দাজনান' নামকস্থানে উট চড়াতেন। তিনি তাঁর খেলাফত কালে একবার এ মাঠ অতিক্রমকালে সঙ্গীদের কাছে বাল্যের স্মৃতিচারন করেছিলেন এভাবেঃ এমন এক সময় ঠিল যখন আমি পশমী জামা পরে এই মাঠে প্রখর রোদ্রে খাত্তাবের উট চড়াতাম। খাত্তাব ছিলেন অত্যন্ত কঠোর ও

নিরস ব্যক্তি। ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নিলে পিতার হাতে প্রহৃত হতাম। কিন্ত আজ আমার এমন দিন এসেছে যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আমার উপর কর্তৃত্ব করার আর কেউ নেই।

যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি তৎকালিন অভিজাত আরবদের অবশ্য শিক্ষনীয় বিষযগুলি যথাঃ যুদ্ধবিদ্যা , কুস্তি, বক্তৃতা, ও বঙশ তালিকা শিক্ষা প্রভৃতি আয়ত্ব করেন। বঙশ তালিকা বা নসবনামা বিদ্যা তিনি লাভ করেন উত্তরাধিকার সুত্রে। তাঁর পিতা ও পিতামহ ছিলেন এ বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী। আরবের 'উকায' মেলায় তিনি কুস্তি লড়তেন। আল্লামা যুবইয়ানী বলেছেনঃ উমর ছিলেন এক মস্তবড় পাহলোয়ান। তিনি ছিলেন জাহেলি আরবের এক মস্ত বড় ঘোড় সওয়ার। আল্লামা জাহিয বলেছেনঃ উমর ঘোড়ায় চড়লে মনে হত ঘোড়ার চামড়ার সাথেও তাঁর শরীর মিশে গেছে। তাঁর মধ্যে কাব্য প্রতিভাও ছিল। তৎকালীন খ্যতনামা কবিদের সব কবিতাই তাঁর মুখস্থ ছিল। আরবী কাব্য সমালোচনার বিজ্ঞানভিত্তিক ধারার প্রতিষ্ঠাতা প্রকৃত পক্ষে তিনিই। ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কিত তাঁর মতামতগুলো পাঠ করলে এ বিষয়ে তাঁর যে কতখানি দখল ছিল তা উপলব্দি করা যায়। বাগ্মিতা ছিল তাঁর সহজাত গুন। যৌবনে তিনি কিছু লেখাপড়া শিখেছিলেন। বালাজুরী লিখেছেনঃ রাসুলে কারীম (সা) এর নবুয়্যত প্রাপইতর সময় গোটা কুরাইশ বঙশে মাত্র সতেরজন লেখাপড়া জানতেন। তাঁদের মধ্যে উমর একজন।

ব্যবসা বাণিজ্য ছিল জাহেলি যুগে আরবদের সম্মানজনক পেশা। উমরও ব্যবসা শুরু করেন এবং তাতে যথেষ্ট উন্নতিও করেন। ব্যবসা উপলক্ষে অনেক দুরদেশে গমণ ও বহু জ্ঞানী- গুনী সমাজের সাথে মেলা-মেশার সুযোগ লাভ করেন। মাসউদি বলেনঃ উমর (রাঃ) জাহেলি যুগে সিরিয়া ও ইরাকে ব্যবসা উপলক্ষে ভ্রমনে যেতেন। ফলে আরব ও আযমের অনেক রাজা- বাদশাহ'র সাথে মেলা- মেশার সুযোগ লাভ করেন। শিবলী নুমানী বলেনঃ জাহেলি যুগেই উমরের সুনাম সমগ্র আরব বিশ্বে ছিড়য়ে পরেছিল। এ কারণে কুরাইশরা সর্বদা তাঁকেই দৌত্যগিরীতে নিয়োগ করতো। অন্যান্যা গোত্রের সাথে কোন বিরোধ সৃষ্টি হলে নিস্পত্তির জন্য তাঁকেই দূত হিসেবে পাঠানো হতো।

উমরের ইসলাম গ্রহণ এক চিত্তাকষৃক ঘটনা। তাঁর চাচাতো ভাই যায়িদের কল্যানে তাঁর বংশে তৌহিদের বাণী একেবারে নতুন ছিল না। তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম যায়িদের পুত্র সাঈদ ইসলাম গ্রহণ করেন। সাঈদ আবার উমরের বোন ফাতিমাকে বিয়ে করেন। স্বামীর সাথে ফাতিমাও ইসলাম গ্রহণ করেন। উমরের বংশের আরো এক বিশিষ্ট ব্যক্তি নাঈম ইবন আব্দুল্লাহও ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্ত তখনও পর্যন্ত উমর ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। সর্ব প্রথম যখন ইসলামের কথা শুনলেন, ক্রোধে জ্বলতে থাকলেন। তাঁর বংশে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাদের তিনি পরম শত্রু হয়ে দাড়ালেন। এরি মধ্যে জানতে পারলে, 'লাবীনা নামক তাঁর এক দাসী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। যাদের উপর তাঁর ক্ষমতা চলতো, নির্মম অত্যাচার চালালেন। এক পর্যায়ে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, ইসলামের মুল প্রচারক মুহাম্মদকেই (সা) দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে হবে। যে কথা সেই কাজ।

আনাস ইবন মালিক হতে বর্ণিতঃ তরবারী কাঁধে ঝুলিয়ে উমর চলেছেন, পথে বনী যুহরার এক ব্যক্তির (মতান্তরে নাঈম ইবন আব্দুল্লাহ'র) সাথে দেখা। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ কোন দিকে উমর ? বললেন, মুহাম্মদের একটা দফারফা করতে। লোকটি বললেন মুহাম্মদের (সা) দফারফা করে বনী হাশিম ও বনী যুহরার হাত থেকে বাঁচবে কিভাবে ? এ কথা শুনে উমর বলে উঠলেন, মনে হচ্ছে তুমিও পৈত্রিক ধর্ম ত্যাগ করে বিধর্মী হয়েছো । লোকটি বললেনঃ উমর একটি বিস্ময়কর খবর শুন, তোমার বোন ও ভগ্নীপতি বিধর্মী হয়ে গেছে। তাঁরা তোমার ধর্ম ত্যাগ করেছে। (আসলে লোকটির লক্ষ্য ছিল উমরকে তার লক্ষ থেকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয়া।) এ কথা শুনে উমর রাগে উম্মত্ত হয়ে ছুটলেন তাঁর বোন ভগ্নীপতির বাড়ীর উদ্দেশ্যে। আবড়ির দরজায় উমরের করাঘাত পরলো। তারা দু'জন তখন খাব্বাব ইবন আল-আরাত এর কাছে কোরআন শিখছিলেন। উমরের আভাষ পেয়ে খাব্বাব তখন বাড়ীর আরেকটি কক্ষে আত্মগোপন করলেন।উমর বোন ভগ্নীপতীকে প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমাদের এখানে গুগুন আওয়াজ শুনছিলাম তা কিসের ? তাঁরা তখন কোরআনের সূরা ত্বাহা পাঠ করছিলেন। তাঁরা উত্তর দিলেনঃ আমরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছিলাম। উমর বললেনঃ সম্ভবতঃ তোমরা নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করে বিধর্মী হয়েছো। ভগ্নীপতি বললেনঃ তোমার ধর্ম ছাড়া অন্য কোথাও যদি সত্য থাকে তুমি কি করবে উমর ? উমর তাঁর ভগ্নীপতির উপর ঝাপিয়ে পরলেন এবং দু'পায়ে তাঁকে ভীষভাবে মাড়াতে লাগলেন। বোন তাঁর স্বামীকে বাচাতে এগিয়ে এলে উমর তাকে ধরে এনে এমন মার দিলেন যে, তাঁর মুখ রক্তাক্ত হয়ে গেল। বোন রাগে উত্তজিত হয়ে বলে উঠলেনঃ সত্য যদি তেমার দ্বীনের বাইরে অন্য কোথাও থেকে থাকে, তাহলে আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই এবং আরো স্বাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর রাসুল।

এ ঘটনার কিছুদিন আগ থেকে উমরের মধ্যে একটা ভাবান্তর সৃষ্টি হয়েছিল। কুরাইশরা মক্কায় মুসলমাদের ওপর নির্মম অত্যাচার- উৎপীড়ন চালিয়ে একজনকেও ফেরাতে পারেনি। মুসলমানরা নীরবে সবকিছু মাথা পেতে নিয়েছে। প্রয়োজনে বাড়ী- ঘর ছেড়েছে, ইসলাম ত্যাগ করেনি। এতে উমারের মনে একটা ধাক্কা লেগেছিল। তিনি রক্ত, তার সত্যের সাক্ষ্য তাঁকে এমন একটি ধাক্কা দিল, যে তাঁর সব দ্বিধা- দ্বন্ধ কর্পূরের মত উড়ে গেল। মুহূর্তে হৃদয় তাঁর সত্যে জ্যোতির উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। তিনি পাক- সাফ হয়ে বোনের হাত থেকে সূরা ত্বাহার অংশটুকু নিয়ে পড়তে শুরু করলেন। পড়া শেষ করে বললেনঃ আমাকে তোমরা মুহাম্মাদের (সা) কাছে নিয়ে চল। উমারের একথা শুনে এতক্ষণে খাব্বাব ঘরের গোপন স্থান থেকে বেরিয়ে এলেন। বললেনঃ সুসংবাদ উমার! বৃহস্পতিবার রাতে রাসূলুল্লাহ (সা) তোমর জন্য দোআ করেছিলেন। আমি আশাকরি তা কবুল হয়েছে। তিনি বলেছিলেনঃ আল্লাহ, উমর ইবনুল খাত্তাব বা আমর ইবন হিশামের দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী কর। খাব্বার আরো বললেনঃ রাসুল (সা) এখন সাফার পাদদেশে 'দারুল আরকামে'।

উমর চললেন দারুল আরকামের দিকে। হামজা এবং তালহার সাথে আরো কিছু সাহাবী তখন আরকামের বাড়ীর দরজায় পাহারারত। উমরকে দেখে তাঁরা সন্ত্রস্ত হয়ে পরলেন। তবে হামজা সান্তনা

দিয়ে বললেনঃআল্লাহ উমরের কল্যান চাইলে সে ইসলাম গ্রহণ করে রাসুল (সাঃ) এর অনুসারী হবে। অন্যথায় তাকে হত্যা করা আমাদের জন্য খুবই সহজ হবে। রাসুল (সা) তখন বাড়ীর ভিতরে তাঁর উপর তখন ওহী নাজিল হচ্ছিল। একটু পরে তিনি বেড়িয়ে উমরের কাছে এলেন। উমরের কাপড় ও তরবারীর হাতল তিনি মুট করে ধরে বললেনঃ উমর তুমি কি বিরত হবে না ?.....তারপর তিনি দোআ করলেনঃ হে আল্লাহ, উমর আমার সামনে, হে আল্লাহ উমরের দ্বারা দ্বীনকে শক্তিশালী কর। উমর বলে উঠলেনঃ আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি আল্লাহর রাসুল। ইসলাম গ্রহণ করেই তিনি আহবান জানালেন,ইয়া রাসুলাল্লাহ ঘর থেকে বেড়িয়ে পরুন। এটা নবুয়তের ষষ্ঠ বছরের ঘটনা।

ইমাম যুহরী বর্ণনা করেনঃ রাসুলাল্লাহ (সাঃ) দারুল আরকামে প্রবেশের পর উমর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পুর্বে নারী- পুরুষ সর্বমোট চল্লিশজনের কিছু বেশী লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। উমরের ইসলাম গ্রহণের পর জিব্রাঈল (আ) এসে বললেনঃ মুহাম্মদ, উমরের ইসলাম গ্রহণে আসমানের অধিবাসীরা উৎফুল্ল হয়েছে।

উমরের ইসলাম গ্রহণে ইসলামের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো। যদিও তখন পর্যন্ত ৪০/৫০জন লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে হযরত হামজাও ছিলেন তথাপি মুসলমানদের পক্ষে কা'বায় গিয়ে নামাজ পড়াতো দুরে কথা নিজেদেরকে মুসলমান বলে প্রকাশ করাও নিরাপদ ছিল না। হযরত উমরের ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে এ অবস্থার পরিবর্তন হলো। তিনি প্রকাশ্যে ইসলামের ঘোষনা দিলেন এবং অন্যদের সঙ্গে নিয়ে কা'বা ঘরে নামাজ আদায় করা শুরু করলেন।

উমর (রা) বলেনঃ আমি ইসলাম গ্রহনের পর সে রাতেই চিন্তা করলাম, মক্কাবসীদের মধ্যে রাসুলাল্লাহ (সাঃ) এর সবচেয়ে বড় কট্টর দুশমণ কে আছে । আমি নিজে গিয়ে তাকে আমার ইসলাম গ্রহণের কথা জানাব। আমি মনে করলাম, আবু জাহেলই সবচেয়ে বড় দুশমন। সকাল হতেই আমি তার দরজায় করাঘাত করলাম। আবু জাহেল বেড়িয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলঃ কি মনে করে ? আমি বললাম আপনাকে এ কথা জানাতে এসেছি যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা) মুহাম্মদরে প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁর আনীত বিধান ও বাণী মেনে নিয়েছি। এ কথা শোনা মাত্র সে আমার মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিল এবং বললঃ আল্লাহ তোকে কলংকিত করুক এবং যে খবর নিয়ে তুই এসছিস তাকেও কলংকিত করুক।

এভাবে এই প্রথমবারের মত মক্কার পৌত্তলিক শক্তি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হলো। সায়্যিদ ইবনে মুসয়্যিব বলেনঃ তাঁর ইসলাম গ্রহণের পর ইসলাম মক্কায় প্রকাশ্য রুপ নেয়। আব্দুল্লাহ ইব মাসউদ (রা) বলেনঃ উমর ইসলাম গ্রহণ কেরই কুরাইশদের সাথে বিবাদ আরম্ভ করে দিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি কা'বায় নামাজ পড়ে ছাড়লেন। আমরাও সকলে তাঁর সাথে নামাজ পড়েছিলাম। সুহায়িব ইন সিনান বলেনঃ তাঁর ইসলাম গ্রহণের পর আমরা কা'বার পাশে জটলা করে বসতাম,কা'বা ঘর তাওয়াফ করতাম, আমাদের সাথে কেউ রুঢ় ব্যবহার করলে তার প্রতিশোধ নিতাম এবং আমাদের উপর যে কোন আক্রমণ আসলে তা প্রতিহত করতাম। তাই রাসুল (সা) তাঁকে '"আল- ফারুক" উপাধীতে ভূষিত করিয়াছিলেন। কারণ তারই কারনে ইসলাম ও কুফরের মধ্যে প্রকাশ্য বিভেদ সৃষ্টি হয়েছিল। রাসুল (সা) বলেছেন, উমরের

জ্বিহবা ও অন্তঃকরনে আল্লাহ তাআলা সত্যকে স্থায়ী করে দিয়েছেন। তাই সে 'ফারুক' , আল্লাহ তাঁর দ্বারা সত্য ও মিথ্যা র মধ্যের পার্থক্য করে দিয়েছেন।

মক্কায় যারা মুশরিকদের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে পরেছিলেন, রাসুল (সা) তাদেরকে মদিনায় হিজরত করতে নির্দেশ দিলেন। আবু সালামা, আব্দুল্লাহ বিন আশহাল, বিল্লাল ও আম্মার বিন ইয়াসিরের মদিনায় হিজরাতের পর বিশজন আত্মীয়- বন্ধুসহ উমর মদিনার পথে পা বাড়ালেন। এ বিশজনের মধ্যে তাঁর ভাই যায়িদ ,ভাইয়ের ছেল সাঈদ, জামাই খুনাইসও ছিলেন। মদিনার উপকন্ঠে কুবা পল্লীতে তিনি রিফায়া ইবন আবদিল মুনজিরের বাড়িতে তিনি আশ্রয় নেন।

উমরের হিজরাত এ অন্যান্যদের হিজরাতের মধ্যে একটা বিশেষ পার্থক্য ছিল। অন্যদের হিজরাত ছিল চুপে চুপে। সকলের অগোচরে। আর উমরের হিজরাত ছিল প্রকাশ্য। তার মধ্যে ছিল কুরাইশদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ও বিদ্রোহের সুর। মক্কা থেকে মদিনায় যাত্রার পুর্বে তিনি প্রথমে কা'বা তাওয়াফ করলেন। তারপর কুরাইশদের আড্ডায় গিয়ে তিনি ঘোষনা করলেন, আমি মদিনা চলছি। কেউঋ যদি তার মাকে পুত্র শোক দিতে চায় সে যেন এ উপত্যকার অপর প্রান্তে আমার মুখোমুখি হয়। এমন একটি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে তিনি মদীনার পথ ধরলেন।কিন্ত কেউ এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণের দুঃসাহস করল না।

বিভিন্ন বর্ণনার মাধ্যমে জানা যায়, রাসুল (সা) বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জনের সাথে উমরের দ্বীনি ভ্রাতৃ-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দেন। আবু বক্কর সিদ্দিক, উয়াইস ইবন সায়িদা, ইতবান ইবন মালিক ও মুয়াজ ইবন আফরা (রা) ছিলেন উমরের দ্বীনি ভাই। তবে এটা নিশ্চিত যে , মদীনায় হিজরাতের পর বনী সালেমের সর্দার ইতবান ইবন মালিকের সাথে দ্বীনি ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

হিজরী প্রথম সাল হতে রাসুলে কারীম (সা) এর ইন্তিকাল পর্যন্ত উমরের কর্মজীবন প্রকৃত পক্ষে রাসুল (সা) এরই কর্মময় জীবনের একটা অংশ বিশেষ। রাসুল (সা) কে যত যুদ্ধ করতে হয়েছিল, যত চুক্তি করতে হয়েছিল, কিংবা সময় সময় যত বিধি প্রবর্তন করতে হয়েছিল এবং ইসলাম প্রচারের জন্য যত পন্থা অবলম্বন করতে হয়েছিল তার এমন একটি ঘটনাও নেই যা উমরের সক্রিয় অংশ গ্রহণ ছাড়া সম্পাদিত হয়েছে। এই জন্য এই সব ঘটনাবলীর বিস্তারিত বিবরণ লিখতে গেলে তা উমরের (রা) জীবনি না হয়েও রাসুল (সা) এর জীবনিতে পরিণত হয়ে যায়। তাঁর কর্মবহুল জীবন ছিল রাসুল (সা) এর জীবনের সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত।

হযরত উমর বদর,ওহুদ, খন্দকসহ সকল যুদ্ধেই রাসুল (সা) এর সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাছাড়া আরো বেশ কিছু সারিয়্যা (যে সব ছোট অভিযানে রাসুল (সা) নিজে উপস্থিত হননি।) তে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বদর যুদ্ধের পরামর্শ দান ও সৈন্য চালনা হতে আরম্ভ করে প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি রাসুল (সা) এর দৃঢ়ভাবে কাজ করেন। বদর যুদ্ধের বন্দীদের সম্পর্কে তাঁর পরামর্শই আল্লাহ পাকের পছন্দ হয়েছিল। এ যুদ্ধে তাঁর ভূমিকা নিম্নরুপঃ

() এ যুদ্ধে কুরাইশ বংশের প্রত্যেক শাখা হতে লোক যোগদান করে; কিন্ত বনী আ'দী অর্থ্যাৎ উমরের খান্দান হতে একটি লোকও যোগদান করেনি। উমরের প্রভাবেই এমনটি হয়েছিল।

() এব যুদ্ধে ইসলামের বিপক্ষে 'উমরের সাথে তাঁর গোত্র ও চুক্তিবদ্ধ লোকদের থেকে মোট বারোজন লোক যোগদান করেছিল।

() এ যুদ্ধে হযরত উমর তাঁর আপন মামা আ'সী ইবন হিশামকে নিজ হাতে হত্যা করেন। এ হত্যার মাধ্যম তিনিই সর্ব প্রথম প্রমাণ করেন, সত্যের পথে আত্মীয় ও প্রিয়জনের প্রভাব প্রাধান্য লাভ করতে পারে না।

উহুদ যুদ্ধেও হযরত উমর (রা) ছিলেন একজন অগ্র সৈনিক। যুদ্ধের এক পর্যায়ে মুসলিম সৈন্যরা যখন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলেন এবং রাসুল (সা) আহত হয়ে মুষ্টিময় কিছু সঙ্খী- সাথী সহ পাহাড়ের এক নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিলেন, তখন কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান নিকটবর্তী হয়ে উচ্চস্বরে মুহাম্মদ (সা), আবু বকর (রা), উমর (রা) নাম ধরে ডেকে জিজ্ঞেস করলো, তোমরা বেচে আছ কি ? রাসুল (সা) এর ইঙ্গিতে কেউই আবু সুফিয়ানের জবাব দিল না । কোন সাড়া না পেয়ে আবু সুফিয়ান ঘোষনা করলঃ নিশ্চয় তারা সকলে নিহত হয়েছে। এ কথায় উমরের পৌরুষে আঘাত লাগলঃ তিনি স্থীর থাকতে পারলেন না। বলে উঠলেনঃ ওরে আল্লাহর দুশমন! আমরা সবাই জীবিত। আবু সুফিয়ান বললোঃ উ'লু- হুবল- হুবলের জয় হোক। রাসুল (সা) এর ইঙ্গিতে উমর জবাব দিলেন,আল্লাহু আ'লা ও আজালু- আল্লাহ মহান ও সম্মানী।

খন্দকের যুদ্ধেও উমর সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। খন্দকের একটি বিশেষ স্থান রক্ষা করার ভার পরেছিল উমরের উপর। আজও সেখানে তাঁর নামে একটি মসজিদ বিদ্যমান থেকে তাঁর সেই স্মাতির ঘোষনা করছে। এ যুদ্ধে একদিন তিনি প্রতিরক্ষায় এত ব্যস্ত ছিলেন যে তাঁর আসরের নামাজ ক্বাজা হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। রাসুল (সা) তাঁকে সান্তনা দিয়ে বলেছিলেন, ব্যসততার কারণে আমিও এখন পর্যন্ত নামাজ আদায় করতে পারিনি।

হুদাইবিয়ার শপথের পুর্বেই হযরত উমর যুদ্ধের প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিলেন। পুত্র আব্দুল্লাহকে পাঠালেন কোন এক আনসারীর নিকট থেকে ঘোড়া আনার জন্য। তিনি এসে খবর দিলেনঃ লোকেরা রাসুল (সা) এর হাতে বাইয়্যাত করছেন। উমর তখর রণসজ্জায় সজ্জিত। এ অবস্থায় তিনি দৌড়ে গিয়ে রাসুল (সা) এর হাতে বাইয়্যেত করেন।

হুদাইবিয়ার সন্ধির শর্তগুলো বাহ্য দৃষ্টিতে মুসলমানদের জন্য অপমানজনক মনে হলো। উমর উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। প্রথমে আবু বকর পরে রাসুল (সা) এর নিকট এ সন্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন। রাসুল (সা) বললেনঃ আমি আল্লাহর রাসুল । আল্লাহর নির্দেশ ব্যতিত কোন কাজ আমি করিনে। উমর শান্ত ও অনুতপ্ত হলেন। নফল রোযা রেখে, নামাজ পড়ে, গোলাম আযাদ করে এবং দান খয়রাত করে এ গোস্তাখীর কাফফারা আদায় করলেন।

খাইবারে ইয়াহুদিদের অনেকগুলি সুরক্ষিত দূর্গ ছিল। কয়েকটি সহজেই জয় হলো। কিন্দ দু'টি কিছুতেই জয় করা গেল না। রাসুল (সা) প্রথম দিন আবু বকর, দ্বিতীয় দিন উমরকে পাঠালেন দূর্গ দু'টি জয় করার জন্য। তাঁরা দু'জনেই ফেরত আসলে অকৃতকার্য হয়ে। তৃতীয়দিন রাসুল (সা) ঘোষনা করলেনঃ আগামীকাল আমি এমন এক ব্যক্তির হাতে ইসলামের পতকা দিব,যার হাতে আল্লাহ বিজয়দান করবেন। পরদিন সাহাবায়ে কিরাম অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে রাসুল (সা) এর দরবারে উপস্থিত হলেন। প্রত্যেকেরই অন্তরে এ গৌরব অর্জণের বাসনা। উমর বললেন আমি খাইবারের এ ঘটনা ব্যতিত কোনদিনই সেনাপতিত্ব বা সরদারীর জন্য লালায়িত হইনি। সে দিনের সেই গৌরব ছিনিয়ে নিয়েছিলেন শেরে-খোদা আলী (রা)।

খাইবারের বিজিত ভূমি মোহাজাহিদদের মধ্যে বণ্টন করা হলো। হযরত উমর তাঁর ভাগের অংশটুকু আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ করে দিলেন। ইসলামের ইতিহাসে এটাই প্রথম ওয়াকফ।

মক্কা বিজয়ের সময় হযরত উমর (রা) ছায়ার মত রাসুল (সা) কে সঙ্গ দেন। ইসলামের মহাশত্রু আবু সুফিয়ান আত্মসমর্পন করতে এলে উমর রাসুল (সা) কে অনুরোধ করেন,অনুমতি দিন এখনই ওর দফা করে দেই। এদিন মক্কার পুরুষরা রাসুল (সা) এর হাতে এবং মহিলারা রাসুল (সা) এর নির্দেশে হযরত উমরের হাতে বাইয়্যেত গ্রহণ করেছিলেন।

হুনাইন অভিযানেও হযরত উমর অংশগ্রহণ করে বীরত্তের সাথে লড়াই করেছিলেন। এ যুদ্ধে কাফেরদের তীব্র আক্রমণে বারো হাজার মুসলিম বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পরেছিল। ইবন ইসহাক বলেনঃ মুহাজির ও আনসারদের মাত্র কয়েকজন বীরই এই বিপদকালে রাসুল (সা) এরসাথে দৃঢ়পদ ছিলেন। তাঁদের মধ্যে আবু বকর, উমর, আব্বাসের (রা) নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

তাবুক অভিযানের সময় রাসুল (সা) এর আবেদনে সাড়া দিয়ে হযরত উমর (রা) তাঁর মোট সম্পদের অর্ধেক রাসুল (সা) এর হাতে তুলে দেন।

রাসুল (সা) এর ইন্তিকালের খবর শুনে হযরত উমর কিছুক্ষন স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকেন। তারপর মসজিদে নববীর সামনে গিয়ে তরবারী কষমুক্ত করে ঘোষনা দেন, যে বলবে আল্লাহর রাসুল ইন্তেকাল করেছেন, আমি তার মাথা দ্বিখন্ডিত করে ফেলবো। এ ঘটনা থেকে রাসুল (সা) এর এর প্রতি উমরের ভক্তি ও ভালবাসার পরিমাণ সহজেই অনুমান করা যায়।

রাসুল (সা) এর ইন্তেকালের পর 'সাকীফা বনী সায়েদায়' দীর্ঘ আলোচনার পর উমর খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে হযরত আবু বকরের হাতে খিলাফতের বাইয়্যেত গ্রহণ করেন। ফলে খলিফা নির্বাচনের মহা সংকট সহজেই কেটে যায়।

খলিফা হযরত আবু বকর যখন বুঝতে পারলেন তাঁর অন্তিম সময় ঘনিয়ে এসেছে, মৃত্যুর পুর্বেই তিনি পরবর্তী খলিফা মনোনীত করে যাওয়াকে তিনি কল্যাণকর মনে করলেন। তাঁর দৃষ্টিতে উমর ছিলেন খিলাফতের যোগ্যতম ব্যক্তি। তা সত্বেও উচুপর্যায়ের সাহাবীদের সাথে এ ব্যাপারে পরামর্শ করা সমীচিন মনে করেন। তিনি আব্দুর রহমান ইবন আউফ (রা) কে ডেকে বললেনঃ উমর সম্পর্কে আপনার মতামত আমাকে জানান। তিনি বললেনঃ তিনিতো যে কোন ব্যক্তি হতে উত্তম; কিন্ত তাঁর চরিত্রে কিছু কঠোরতা আছে। আবু বকর বললেনঃ তার কারণ ; আমাকে তিনি কোমল দেখেছেন, খিলাফতের দায়িত্ব কাঁধে পরলে এ কঠোরতা অনেকটা কমে যাবে। তারপর আবু বকর অনুরোধ করলেন, তাঁর সাথে আলোচিত বিষয়টি কারো সাথে ফাঁস না করার জন্য। অতঃপর তিনি উসমা বিন আফফানকে ডাকলেন। বললেন, আবু আবদিল্লাহ, উমর সম্পর্কে আপনি আপনার মতামত আমাকে জানান। উসমান বললেনঃ আমার থেকে আপনিই তাঁকে বেশী জানেন। আবু বকর বললেনঃ তা সত্বেও আপনার মতামত আমাকে জানান। উসমান বললেনঃ তাঁকে আমি যতটুকু জানি তাতে তাঁর বাইরে থেকে ভিতরটা বেশী ভাল। তাঁর মত দ্বিতীয় একউ আমাদের মধ্যে নেই। আবু বকর (রা) তাদের দুজনের মধ্যে আলাপের বিষয়টি গোপন রাখার অনুরোধ করে তাঁকে বিদায় দিলেন।

এভাবে বিভিন্নজনের কাছ হতে মতামত নেওয়া শেষ হলে তিনি উসমান ইবন আফফানকে ডেকে ডিটেকশন দিলেনঃ বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। এটা আবু বকর ইবন আবী কুহাফার পক্ষ থেকে মুসলমানদের প্রতি অঙ্গিকার । আম্মা বা'দ – এতটুকু বলার পর তিনি সংঙ্গা হারিয়ে ফেলেন। তারপর উসমান ইবন আফফান নিজেই সংযোজন করেন- 'আমি তোমাদের জন্য উমর ইবন খাত্তাবকে খলিফা মনোনিত করলাম এবং এ ব্যাপারে তোমাদের কল্যাণ চেষ্টায় কোন ক্রুটি করি নাই'। অতঃপর আবু বকর সংঙ্গা ফিরে পান।লিখিত অংশটুকু তাঁকে পড়ে শুনানো হলো। সবটুকু শুনে তিনি 'আল্লাহু আকবর' বলে উঠেন এবং বলেনঃ আমার ভয় হচ্ছিল, আমি সংঙ্গাহীন অবস্থায় মারা গেলে লোকেরা মতভেদ সৃষ্টি করবে। উসমানকে লক্ষ্য করে তিনি আরো বলেনঃ আল্লাহ তাআলা ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষ থেকে আপনাকে কল্যাণ দান করুন।

তাবারী বলেনঃ অতঃপর আবু বকর উপস্থিত লোকদের দিকে তাকালেন। তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতু উমাইস তখন তাঁকে ধরে রেখেছিলেন। সমবেত লোকদের তিনি বললেনঃ যে ব্যক্তিকে আমি আপনাদের জন্য মনোনিত করে যাচ্ছি তাঁর প্রতি কি আপনার সন্তুষ্ট ? আল্লাহর কসম, মানুষের মতামত নিতে আমি চেষ্টার ক্রুটি করিনি। আমি উমর ইবনুল খাত্তাবকে আপনাদের খলিফা মনোনিত করেছি। আপনারা তাঁর কথা শুনুন, তাঁর আনুগত্য করুন। এভাবে উমরে খিলাফত শুরু হয় হিজরী ১৩ সনের ২২শে জমাদিউস সানী মোতাবেক ১৩ই আগষ্ট ৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দ।

হযরত উমরের রাষ্ট্র শাসন পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা সম্ভব নয়। দশ বছরের স্বল্প সময়ে গোটা বাইজান্টাইন রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের পতন ঘটান। তাঁর যুগে বিভিন্ন অঞ্চলসহ মোট ১০৩৬টি

শহর বিজিত হয়। ইসলামি হুকুমাতের নিয়মতান্ত্রিক মুলতঃ তাঁর যুগেই আত্ম প্রকাশ করে। তাঁর শাসন ও ইনসাফের কথা সারা বিশ্বের মানুষের কাছে কিংবদন্তীর মত ছড়িয়ে আছে।

হযরত উমর প্রথম খলিফা যিনি আমিরুল মোমেনীন উপাধী লাভ করেন। তিনিই সর্ব প্রথম হিজরী সন প্রবর্তন করেন, তারাবীর নামাজ জামাতে পড়ার ব্যবস্থা করেন, জন শাসনের জন্য দুররা বা ছড়ি ব্যবাহর করেন, মদ্যপানে আশিটি বেত্রাঘাত নির্ধারন করেন, বহু রাজ্য জয় করেন, নগর পত্তন করেন,সেনাবাহীনিরে স্তরভেদ ও বিভিন্ন ব্যাটালিয়ন নির্দিষ্ট করেন, জাতীয় রেজিষ্টার বা নাগরিক তালিকা তৈরী করেনকাজী নিয়োগ করেন,রাষ্ট্রকে বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত করেন।

উমর ছিলেন রাসুলাল্লাহ (সাঃ) এর অন্যতম কাতিব। নিজ কন্যা হযরত হাফসাকে রাসুলাল্লাহ (সাঃ) এর বিয়ে দেন। তিনি রাসুলাল্লাহ (সাঃ) ও আবু বকর (রা) এর মন্ত্রী ও উপদেষ্টার ভুমিকা পালন করেন।ইসলাম গ্রহণের পুর্বে ও পরে ব্যবসা ছিল তাঁর জীবিকার উপায়। খিলাফতের গুরু দায়িত্ব কাধে পরার পরেও কয়েক বছর পর্যন্ত ব্যবসা চালিয়ে যান। কিন্ত পরে তা অসম্ভব হয়ে দাড়ালে হযরত আলী (রা) সহ উচু পর্যায়ের সাহাবীরা পরামর্শ করে বাইতুল মাল হতে বার্ষিক ৮০০ দিরহাম ভাতা নর্থারন করেন। হিজরী ১৫ সনে বাইতুল মাল থেকে অন্য লোকদের ভাতা নর্ধারিত হলে বিশিষ্ট সাহাবীদের ভাতার সমান তাঁরও ভাতা ধার্য করা হয় পাঁচ হাজার দিরহাম।

বাইতুল মালের অর্থের ব্যাপারে হযরত উমরের দৃষ্টি ভঙ্গি ছিল এতিমের অর্থের মত। এতিমের অর্থসম্পদ যেমন এতিমের অভিভাবক রক্ষনাবেক্ষন করে । এতিমেরও নিজের জন্য প্রয়োজনমত খরচ করতে পারে কিন্ত অপচয় করতে পারে না। প্রয়োজন না হলে এতিমের সম্পদ হতে হাত গুটিয়ে নিয়ে শুধু হিফাজত করে এবং এতিম বড় হলে তাকে তার সম্পদ ফিরিয়ে দেয়। বাইতুল মালের প্রতি হযরত উমরের এ দৃষ্টি ভঙ্গিই সর্বদা তার কর্ম ও আচরণে ফুটে উঠেছে।

হযরত উমর (রা) সব সময় একটা দোররা বা ছড়ি হাতে নিয়ে চলতেন। শয়তানও তাকে দেখে পালাতো। তাই বলে তিনি অত্যাচারী ছিলেন না। তিনি ছিলেন কঠোর ন্যায় বিচারক। মানুষকে তিনি হৃদয় দিয়ে ভালবাসতেন, মানুষও তাঁকে ভালবাসতো। তাঁর প্রজা পালনের বহু কাহিনী ইতিহাসে পাওয়া যায়।

হযরত ফারুকে আয়মের ফজিলত ও মর্যাদা সম্পর্কে কোরআন ও হাদীসে এত বেশী ইঙ্গিত ও প্রকাশ্য বাণী রয়েছে যে, সংক্ষিপ্ত কোন প্রবন্ধে তা প্রকাশ করা সম্ভব না। আল্লাহ ও তাঁর রাসলের (সা) ‘র নিকট তাঁর স্থান অতি উচ্চে। এ জন্যে বলা হয়েছে, উমরের সব মতের সমর্থনেই সর্বদা কোরআএর আয়াত নাযিল হয়েছে। হযরত আলী (রা) বর্ণনা করেনঃ ‘খাইরুল উম্মাতি বা’দা নাবিয়্যিহা আবু বকর সুম্মা উমর’-নবী (সাঃ) এর পর উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম আবু বকর, তারপর উমর। হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ বলেনঃ উমরের ইসলাম গ্রহণ ইসলামের বিজয়। তাঁর হিজরাত আল্লাহর সাহায্য এবং তাঁর

ফিলাফত আল্লাহর রহমত। উমরের যাবতীয় গুনাবলী লক্ষ্য করেই হুজুর (সা) বলেছিলেনঃ ‘লাও কানা বা’দী নাবিয়্যুন লা কানা উমর’-আমার পরে কেউ নবী হলে উমরই হতো। কারণ তাঁর মধ্যে ছিল নবীদের স্বভাব বৈশিষ্ট্য।

জ্ঞান- বিজ্ঞানের চর্চা ও প্রসারের ক্ষেত্রে উমরের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। তিনি আরবী কবিতা –পাঠন ও সংনক্ষনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। আরবী ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষার প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত সজাগ; তাঁর সামনে ভাষার ব্যাপারে কেউ ভুল করলে শাসিয়ে দিতেন। বিশুদ্ধভাবে আরবী ভাষা শিক্ষা করাকে তিনি দ্বীনের অঙ্গ বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। আল্লামা জাহাবী বলেনঃ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে উমর ছিলেন অত্যন্ত কঠোর একই হাদীস বিভিন্ন সনদের মাধ্যমে বর্ণনার প্রতি তিনি তাগিদ দিতেন।

প্রখ্যাত সাহাবী মুগীরা ইবন শু’বার (রা) অগ্নি উপাসক দাস আবু লুলু ফিরোজ ফজরের নামাযে দাড়ানো অবস্থায় এ মহান খলিফাকে ছুরিকাঘাত করে। আহত হওয়ার তৃতীয় দিনে হিজরী ২৩ সনের ২৭শে জিলহজ্জ বুধবার তিনি ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর পূর্বে আলী, উসমান, আব্দুর রহমানইবন আউফ, সা’দ,যুবাইর ও তালহা (রা) এ ছয়জন বিশিষ্ট সাহাবীর উপর তাদের মধ্য থেকে কোন একজনকে খলিফা নির্বাচনের দায়িত্ব অর্পন করে যান। হযরত সুহায়িব জানাজার নামাজ পড়ান। রওজায়ে নববীর মধ্যে হযরত সিদ্দিকে আকবরের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। তাঁর খিলাফতকাল দশ বছর ৬ মাস ৪ দিন।

প্রচেষ্টা
একটি ইসলামিক শিক্ষার ওয়েবসাইট

হযরত উসমান (রা)

নাম ‘উসমান’ কুনিয়াত (ডাকনাম) আবু আমর, আবু আবদিল্লাহ, আবু লায়লা এবং লকব যুননুরাইন। পিতা আফফান, মাতা আরওরা বিনতু কুরাইয। কুরাইশ বংশের উমাইয়্যা শাখাআর সন্তান। তাঁর উর্ধ পুরুষ ‘আবদে মান্নাফে’ গিয়ে হুজুর (সা) এর নসবের সাথে তাঁর নসব মিলিত হয়েছে। খুলাফায়ে রাশিদার তৃতীয় খলিফা। জন্ম হস্তী সনের ছ’বছর পরে ৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে। এ হিসাবে রাসুলে মাকবুল হযরত মোহাম্মদ (সা) থেকে তিনি ছয় বছরের ছোট। তবে তাঁর জন্ম সন সম্পর্কে বিস্তর মতভেদ রয়েছে। ফলে শাহাদাতের সময় তাঁর সঠিক বয়স কত ছিল সে সম্পর্কে অনুরুপ মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন বর্ণনা মতে, তাঁর জন্ম হয় তায়েফে।

হযরত উসমান (রা) ছিলেন মধ্যমাকৃতির সুঠাম দেহের অধিকারী। মাংসহীন গন্ডদেশ,ঘন দাড়ি, উজ্জল ফর্সা, ঘন কেশ, বুক ও কোমর চওড়া, কান পর্যন্ত ঝোলানো যুলফী, পায়ের নালা মোটা,পশম ভরা লম্বা বাহু, মুখে বসন্তের দাগ, মেহেদী রংঙের দাড়ি এবং স্বর্ণখচিত দাঁত।

হযরত উসমান (রা)’র জীবনের প্রাথমিক অবস্থা অন্যান্য সাহাবীর মত জাহেলি যুগের অন্ধকারেই রয়ে গেছে। তাঁর ইসলামপুর্ব জীবন এমনভাবে বিলীন হয়েছে যেন ইসলামের সাথেই তাঁর জন্ম। ইসলামপুর্ব জীবনের বিশেষ কোন তথ্য ঐতিহাসিকরা আমাদের কাছে পৌছাতে পারেরননি।

হযরত উসমান (রা) ছিলেন কুরাইশ বংশের অন্যতম কুষ্টিবিদ্যা বিশারদ। কুরাইশদের প্রাচীন ইতিহাসেও ছিল তাঁর গভীর জ্ঞান। তাঁর প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা, সৌজন্য ও লৌকিকতাবোধ ইত্যাদি গুনাবলীর জন্য সব সময় তাঁর পাশে মানুষের ভীড় জমে থাকত। জাহেলী যুগের কোন অপকর্ম তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। লজ্জা ও প্রখর আত্মমর্যাদাবোধ ছিল তাঁর মহান চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। যৌবনে তিনি অন্যান্য অভিজাত কুরইশদের মত ব্যবসা শুরু করেন। সীমাহীন সততা ও বিশ্বস্ততার গুনে ব্যবসায়ে অসাধারন সাফল্য লাভ করেন। মক্কার সমাজে একজন বিশিষ্ট ধনী ব্যবসায়ী হিসেবে ‘গণী’ উপাধি লাভ করেন।

হযরত উসমান (রা) কে ‘আস- সাবেকুনাল আওয়ালুন’ (প্রথম পর্বে ইসলাম গ্রহণকারী), ‘আশারায়ে মুবাশশারা’ এবং সেই ছ’জন শ্রেষ্ট সাহাবীর মধ্যে গণ্য করা হয়, যাদের প্রতি রাসুলে মকবুল (সা) আমরণ খুশি ছিলেন। আবু বকর সিদ্দীকের সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। তাঁরই তাবলীগ ও উৎসাহে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। মক্কার আরো অনেক নের্তৃবৃন্দের আচরণের বিপরীত হযরত উসমান (রা) রাসুলাল্লাহ (সা)’র নবুয়্যতের সূচনা পর্বেই তাঁর দাওয়াতে সাড়া দেন এবং আজীবন জান মাল ও সহায় সম্পত্তি দ্বারা মুসলমানদেরকল্যাণব্রতী ছিলেন। হযরত উসমান (রা) বলেন, আম,ই ইসলাম গ্রহণকারী

চারজনের মধ্যে চতুর্থ। ইবন ইসহাকের মতে, আবু বকর, আলী, যায়িদ বিন হারিসের পরে ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম ব্যক্তি হযরত উসমান (রা)।

হযরত উসমান (রা)'র ইসলাম গ্রহণের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সীরাত লেখক ও মুহাদ্দিসগণ যেসব বর্ণনা দিয়েছেন তার সারকথা নিম্নরুপঃ

কেউ কেউ বলেন, তাঁর খালা সু'দা ছিলেন সে যুগের একজন বিশিষ্ট 'কাহিন' বা ভবিষ্যদ্বক্তা। তিনি নবী করমি (সা) সম্পর্কে হযরত উসমান (রা) কে কিছু কথা বলেন এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনার জন্য উৎসাহ দেন। তারই উৎসাহে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। পক্ষান্তরে ইবন সা'দ সহ আরো অনেকে বর্ণনা করেন, হযরত উসমান (রা) সিরিয়া সফরে ছিলেন। যখন তিনি 'মুয়ান ও যারকার' মধ্যকর্তী স্থানে বিশ্রাম করছিলেন তখন তন্দ্রালু অবস্থায় এক আহবানকারীকে বলতে শুনলেনঃ ওহে ঘুমন্ত ব্যক্তিরা, তাড়াতাড়ি কর। আহমাদ নামের রাসুল মক্কায় আত্মপ্রকাশ করেছেন। মক্কায় ফিরে এসে শুনতে পেলেন ব্যাপারটি সত্য অতঃপর আবু বকরের আহবানে ইসলাম গ্রহণ করেন।

হযরত উসমান (রা) যখন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তখন তাঁর বয়স ত্রিশের উপরে। ইসলামপুর্ব যুগেও আবু বকরের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সর্ম্পক ছিল। প্রায়া প্রতিদিনই তাঁর আবু বকরের বাড়িতে যাতায়াত ছিল। একদনি হযরত আবুবকর (রা) তাঁর সামনে ইসলাম পেশ করলেন। ঘটনাক্রমে রাসুল (সা) ও তখন সে পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেনঃ উসমান, জান্নাতের প্রবেশকে মেনে নাও। আমি তোমাদের এবং আল্লাহর সকল মাখলুকের প্রতি তাঁর রাসুল হিসেবে এসেছি। একথা শুনার পর সাথে সাথে তিনি ইসলাম কবুল করেন। হযরত উসমানের ইসলাম কবুলের পর তাঁর খালা সু'দা তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি কাসিদা রচনা করেছিলেন।

হযরত উসমানের সহোদরা আমিনা বৈপিত্রীয় ভাই- বোন ওয়ালিদ, খালিদ,আম্মারা, উম্মু কুলসুম সবাই মুসলমান হয়েছিলেন। তাদের পিতা উকবা ইবন আবী মুয়িত। দারু কুতনী বর্ণনা করেছেন, উম্মু কুলসুম প্রথম পর্বের একজন মুহাজির। বলা হয়েছে তিনিই প্রথম কুরাইশ বধু যিনি রাসুলাল্লাহ (সা) এর হাতে বাইয়্যেত করেন। হযরত উসমানের অন্য ভাই- বোন মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইসলাম গ্রহণের পর কুরাইশদের একজন সম্মানীত ব্যক্তি হওয়া সত্বেও তাঁকে ইসলামের শত্রুদের লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়। তাঁর চাচা হাকাম ইবন আবিল 'আস তাঁকে রশি দিয়ে বেধে বেদম মার দিত। সে বলতো, একটা নতুন ধর্ম গ্রহণ করে তুমি আমাদের বাপ- দাদার মুখে কালি দিয়েছো। এ ধর্ম ত্যাগ না করা পর্যন্ত তোমাকে ছাড়া হবে না। এত হযরত উসমানের ঈমান একটুও টলেনি। তিনি বলতেনঃ তোমাদের যা ইচ্ছে কর, এ দ্বীন আমি কক্ষনো ছাড়তে পারবো না।

হযরত উসমান ইসলাম গ্রহণের পর রাসুলাল্লাহ (সা) নিজ কন্যা রুকাইয়্যাকে তাঁর সাথে বিয়ে দেন। হিজরী দ্বিতীয় সনে মদীনায় রুকাইয়্যার ইন্তেকাল হলে রাসুলাল্লাহ (সা) তাঁর দ্বিতীয় কন্যা উম্মু কুলসুমকে তাঁর সাথে বিয়ে দেন। এ কারণে তিনি 'যুন- নুরাইন'-দুই জ্যোতির অধিকারী উপাধী লাভ করেন।

রুকাইয়্যা ছিলেন হযরত খাদিজার (রা) গর্ভজাত সন্তান। তাঁর প্রথম শাদী হয় উতবা ইবন আবী লাহাবের সাথে এবং উম্মু কুলসুমের শাদী হয় আবু লাহাবের দ্বিতীয় পুত্র উতাইবার সাথে। আবু লাহাব ছিল আল্লাহর নবীর কট্টর দুশমণ। পবিত্র কোরআনের সূরা লাহাবের নাযিলের পর আবু লাহাব ও তার স্ত্রী উম্মু জামীল (হাম্মা লাতাল হাতাব) তাদের পুত্রদ্বয়কে নির্দেশ দিল মুহাম্মদের কন্যাদ্বয়কে তালাক দেওয়ার জন্য। তারা তালাক দিল। অবশ্য ইমাম সুয়্যতি মনে করেন। ইসলাম গ্রহণের পুর্বেই রুকাইয়ার সাথে উসমানের শাদী হয়। উপরোক্ত ঘটনার আলোকে সুয়্যতীর মতটি গ্রহণযোগ্য মনে হয় না।

নবুয়্যতের পঞ্চম বছরে মক্কার মুশরিকদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ্য হয়ে প্রথম যে দলটি হাবশায় হিজরত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উসমান ও তাঁর স্ত্রী রুকাইয়্যাও ছিলেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, হাবশার মাটিতে প্রথম হিজরতকারী উসমান ও তাঁর স্ত্রী নবী দুহিতা রুকাইয়্যা। রাসূল (সা) দীর্ঘদিন তাঁদের কোন খোঁজ- খবর না পেয়ে ভীষণ উৎকন্ঠিত হয়ে পড়েন। সেই সময় এক কুরাইশ মহিলা হাবশা থেকে মক্কায় এলো। তাঁর কাছে রাসূল (সা) তাঁদের দু'জনের কুশল জিজ্ঞসা করেন। সে সংবাদ দেয়, আমি দেখেছি, রুকাইয়্যা গাধার ওপর সওয়ার হয়ে আছে এবং উসমান গাধাটি তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। রাসূল (সা) তাঁর জন্য দু'আ করেনঃ আল্লাহ তার সহায় হোন। লূতের (আ) পর "উসমান আল্লাহর রাস্তায় পরিবারসহ প্রথম হিজরতকারী। হাবশা অবস্থানকালে তাঁদের সন্তান আবদুল্লাহ জন্মগ্রহন করে এবং এ ছেলের নাম অনুসারে তাঁর কুনিয়াত হয় আবু আবদুল্লাহ। হিজরী ৪র্থ সনে আবদুল্লাহ মারা যান। রুকাইয়্যার সাথে তাঁর দাম্পত্য জীবন খুব সুখের হয়েছিল। লোকেরা বলাবলি করতো কেউ যদি সর্বোত্তম জুটি দেখতে চায়, সে যেন উসমান ও রুকাইয়্যাকে দেখে।

হযরত উসমান বেশ কিছু দিন হাবশায় অবস্থান করেন। অতঃপর মক্কায় ফিরে আসেন এই গুজব শুনে যে, মক্কার নেতৃবৃন্দ ইসলাম গ্রহন করেছে। রাসূলুল্লাহর (সা) মদীনায় হিজারাতের পর আবার তিনি মদীনায় হিজরত করেন। এভাবে তিনি "যুল হিজরাতইন" দুই হিজরাতের অধিকারী হন।

একমাত্র বদর ছাড়া সকল যুদ্ধে তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে অংশগ্রহন করেছেন। রাসূল (সা) যখন বদরে যুদ্ধে রওয়ানা হন, হযরত রুকাইয়্যা তখন রোগ শয্যায়। রাসূলের (সা) নির্দেশে হযরত উসমান পীড়িত স্ত্রীর সেবার জন্য মদীনায় থেকে যান। বদরের বিজয়ের খবর যেদিন মদীনায় এসে পৌছুলো সেদিনই হযরত রুকাইয়্যা ইনতিকাল করে। রাসূল (সা) উসমানের জন্য বদরের যোদ্ধাদের মত সওয়াব ও গনীমতের অংশ ঘোষনা করেন। এ হিসাবে পরোক্ষভাবে তিনিও বদরী সাহাবী।

রুকাইয়্যার ইনতিকালের পর রাসূল (সা) রুকাইয়্যার ছোট বোন উম্মু কুলসুমকে উসমানের সাথে বিয়ে দেন হিজরী তৃতীয় সনে। একটি বর্ণনায় জানা যায়, আল্লাহর নির্দেশেই রাসূল (সা) উম্মু কুলসুমকে উসমানের সাথে বিয়ে দেন। হিজরী নবম সনে উম্মু কুলসুমকও নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান। উম্মু কুলসুমের মৃত্যুর পর রাসূল (সা) বলেনঃ আমার যদি তৃতীয় কোন মেয়ে থাকতো তাকেও আমি উসমানের সাথে বিয়ে দিতাম।

হযরত উসমান উহুদের যুদ্ধেও অংশগ্রহন করেন। কিন্তু সেই মুষ্টিমেয় কিছু যোদ্ধাদের মত রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে অটল থাকতে পারেননি। অধিকাংশ মুজাহিদদের সাথে তিনিও ময়দান ছেড়ে চলে যান। অবশ্য আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্য ক্ষমা ঘোষনা করেছেন। পরবর্তী সকল যুদ্ধেই অন্যসব বিশিষ্ট সাহাবীদের মত অংশগ্রহন করেছেন।

রাসূল (সা) তাবুক অভিযানের প্রস্তুতির ঘোষনা দিলেন। মক্কা ও অন্যান্য আরব গোত্রসমূহেও ঘোষনা দিলেন। এ অভিযানে অংশগ্রহণের জন্য। ইসলামী ফৌজের সংগঠন ও ব্যয় নির্বাহের সাহায্যের আবেদন জানালেন। সাহাবীরা ব্যাপকভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। আবু বকর তাঁর সকল অর্থ রাসূলের হাতে তুলিয়ে দিলেন। উমর তাঁর মোট অর্থের অর্ধেক নিয়ে হাজির হলেন। আর এ যুদ্ধের এক তৃতীয়াংশ সৈন্যের যাবতীয় ব্যয়ভার উসমান নিজ কাঁধে তুলে নিলেন। তিনি সাড়ে নয় শ' উট ও পঞ্চাশটি ঘোড়া সরবরাহ করেন। ইবন ইসহাক বলেন, তাবুকের বাহিনীর পেছেনে হযরত উসমান এত বিপুল অর্থ ব্যয় ব্যয় করেন যে, তাঁর সবপরিমাণ আর কেউ ব্যয় করতে পারেনি। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, তাবুকের প্রস্তুতির জন্য উসমান কোচরে করে এক হাজার দীনার নিয়ে এসে রাসূলুল্লাহর (সা) কোলে ঢেলে দেন। রাসূল (সা) খুশীতে দীনারগুলি উল্টে পাল্টে দেখেন এবং বলেনঃ আজ থেকে উসমান যা কিছুই করবে, কোন কিছুই তার জন্য ক্ষতি হবেনা। এভাবে অধিকাংশ যুদ্ধের প্রস্তুতির সময় প্রাণ খুলে চাঁদা দিতেন। একটি বর্ণনায় এসেছে, তাবুকের যুদ্ধে তাঁর দানে সন্তুষ্ট হয়ে রাসূল (সা) তাঁর আগে- পিছনে সকল গুনাহ মাফের জন্য দু'আ করেন এবং তাঁকে জান্নাতের ওয়াদা করে।

হুদাইবিয়ার ঘটনা। রাসূল (সা) উমারকে ডেকে বললেনঃ তুমি মক্কায় যাও। মক্কার নের্তৃবৃন্দকে আমাদের আগমণের উদ্দেশ্য অবহিত কর। 'উমর বিনীতভাবে বললেনঃ ইয়া রাসুলুল্লাহ (সা)! কুরাইশদের কাছ থেকে আমার জীবনের আশঙ্খা করছি। আপনি জানেন তাদের সাথে আমার দুশমনি কতখানি। আমি মনে করি উসমানই এ কাজের উপযুক্ত। রাসুলে করামি (সা) উসমানকে ডাকলেন। আবু সুফিয়ান ও অন্যান্য কুরাইশ নের্তৃবৃন্দের নিকট এ পয়গামসহ উসমানকে পাঠালেন যে, আমরা যুদ্ধ নয় বরং 'বাইতুল্লাহর' যিয়ারতের উদ্দেশ্যে এসেছি।

রাসুলে করিম (সা) এর পয়গাম নিয়ে উসমান (রা) মক্কায় পৌছলেন। সর্ব প্রথম আবান ইবন সাঈদ ইবন আ'স এর সাথে তাঁর দেখা হয়। আবান তাঁকে নিরাপত্তা দেন। আবানকে সঙ্গে করে তিনি কুরাইশ নের্তৃবৃন্দের সাথে দেখা করে রাসুলুল্লাহ (সা) এর পয়গাম পৌঁছে দেন। তারা উসমানকে বলে, তুমি ইচ্ছে

করলে ‘তাওয়াফ’ করতে পার। কিন্ত উসমান তাদের এ প্রস্তাব প্রত্যাখান করে বলেন, আল্লাহর রাসুল মুহাম্মদ (সা) যতক্ষন ‘তাওয়াফ’ না করেন, আমি তাওয়াফ করতে পারিনে। কুরাইশরা তাঁর এ কথায় ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁকে আটক করে। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে উসমানকে তারা তিনদিন আটক করে রাখে। এদিকে হুদাইবিয়ায় মুসলিম শিবিরে গুজব ছড়িয়ে পরে উসমানকে শহীদ করা হয়েছে। রাসুল (সা) ঘোষনা করলেনঃ উসমানের রক্তের বদলা না নিয়ে আমরা প্রত্যাবর্তন করব না। রাসুল (সা) নিজের ডান হাতটি বাম হাতের উপর রেখে বললেনঃ হে আল্লাহ এ বাইয়্যেত উসমানের পক্ষ হতে। সে তোমার ও তোমার রাসুলের কাজে মক্কায় গেছে। হযরত উসমান মক্কা থেকে ফিরে এস বাইয়াতের কথা জানতে পারেন। তিনি নিজেও রাসুলুল্লাহর হাতে বাইয়েত করেন। ইতিহাসে এ ঘটনা ‘বাইয়াতু রিদওয়ান’, ‘বাইতুশ শাজারা’ ইত্যাদি নামে খ্যাত হয়েছে। পবিত্র কোরআনে এ বাইয়্যেতের প্রশংসা করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা)’র ওফাতের পর যখন আবু বকরের হাতে বাইয়াত নেয়া হচ্ছিল উসমান খবর পেয়ে খুব দ্রুত সেখানে যান এবং আবু বকরের হাতে বাইয়াত করেন। মৃত্যুকালে আবু বকর উমর (রা) কে খলিফা মনোনিত করে যে অঙ্গিকার পত্রটি লিখে যান তার লেখক ছিলেন উসমান। খলীফা উমরের হাতে তিনিই সর্ব প্রথম বাইয়াত করেন।

হযরত উমর যখন ছুরিকাহত হয়ে মৃত্যু শয্যায়, তাঁর কাছে দাবী করা হলো পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের জন্য। কিন্ত তিনি ইতস্ততঃ করে বললেনঃ আমি যদি খলিফা বানিয়ে যাই, তবে তার দৃষ্টান্ত অবশ্য আছে, যেমনটি করেছেন আমার চেয়েও এক উত্তম ব্যক্তি , অর্থ্যাৎ আবু বকর (রা) আর যদি না ও বানিয়ে যাই তারও দৃষ্টান্ত আছে। যেমনটি করেছেন আমার চেয়েও এক উত্তম ব্যক্তি অর্থ্যাৎ রাসুলে করিম (সা)। তিনি আরো বললেনঃ আবু উবাইদা বেঁচে থাকলে তাকেই খলিফা বানিয়ে যেতাম। আমার রব আমাকে জিজ্ঞাসা করলে বলতামঃ আপনার নবীকে আমি বলতে শুনেছি, তিনি এই উম্মতের আমিন বা পরম বিশ্বাসী ব্যক্তি। যদি আবু হুজাইফার আজাদকৃত দাস সালেমও বেঁচে থাকতো , তাকেও খলিফা বানিয়ে যেতে পারতাম, আমার রব জিজ্ঞাসা করলে বলতামঃ আপনার নবীকে আমি বলতে শুনেছি, সালেম বড় আল্লাহ প্রেমিক। এক ব্যক্তি তখন বললঃ আবদুল্লাহ ইবন উমরতো আছে। আল্লাহ তোমার অমঙ্গল করুন। কসম আল্লাহর, আমি আল্লাহর কাছে এমনটি চাইনা। খিলাফতের এ দায়িত্বের মধ্যে যদি ভাল কিছু থাকে , আমার বংশের থেকে আমি তা লাভ করেছি। আর যদি তা মন্দ হয় তাও আমরা পেয়েছি। উমরের বংশের এক ব্যক্তির হিসেব নিকেশই এ জন্য যথেষ্ঠ । আমি আমার নিজের নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছি, আমার পরিবারবর্গকে মাহরুম করেছি। কোন পুরস্কারও নয় এবং কোন তিরস্কারও নয় এমনভাবে যদি কোনমতে আমি রেহাই পাই, নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করব।

যখন একই কথা তাঁর কাছে আবার বলা হলো, তিনি আলী (রা)’র দিকে ইঙ্গিত করে বললেনঃ তোমাদেরকে হকের উপর পরিচালনার জন্য তিনিই যোগ্য। তবে আমি জীবিত বা মৃত উভয় অবস্থা এ দায়িত্ব পালন করতে রাজী নই। তোমাদের সামনে এই একটি দল আছেন যাঁদের সম্পর্কে রাসুলে মকবুল (সা) বলেছেন, তাঁরা জান্নাতের অধিবাসী। তাঁরা হলে আবদে মান্নাফের দুই পুত্র আলী ও উসমান। রাসুল (সা) এর দুই মাতুল (মামা) আব্দুর রহমান ও সা’দ ও রাসুল (সা) এর হাওয়ারী ও

ফুফাতো ভাই যুবাইর ইবনল আওয়াম এবং তালহা। তাঁদের যে কোন একজনকে খলিফা নির্বাচিত করবে। তাঁদের যে কেউ খলিফা নিযুক্ত হলে তোমরা তাঁকে সাহায্য করবে, তাঁর সাথে সুন্দর আচরণ করবে। তিনি যদি তোমাদের উপর কোন দায়িত্ব অর্পন করেন, যথাযথ ভাবে তোমরা তা পালন করবে।

হযরত উমর উল্লেখিত দলটির সদস্যদের ডেকে বললেনঃ আপনাদের ব্যাপারে আমি ভেবে দেখেছি। আপনারা জনগনের নেতা ও পরিচালক। খিলাফতের দায়িত্বটি আপনাদের মধ্যেই থাকা উচিৎ। আপনাদের প্রতি সন্তুষ্ট অবস্থায় রাসুল (সা) ইন্তিকাল করেছেন। আপনারা ঠিক থাকলে জনগনের ব্যাপারে আমার কোন ভয় নাই। তবে আপনাদের পারস্পরিক বিবাদকে আমি ভয় করি। জনগণ তাতে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পরবে।

তারপর তিনি নির্বাচনের সময় নির্ধারন করেছিলেন তাঁর মৃত্যুর পর তিনদিন তিন রাত্রি। মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদকে বললেনঃ আমাকে কবরে শায়িত করার পর এই দলটিকে একত্রিত করবে এবং তাঁরা তাদের মধ্য থেকে একজনকে নির্বাচিত করবে। সুহায়িবকে বললেনঃ তিনদিন তুমি নামাজের জামাতের ইমামতি করবে। আলি, উসমান, সা'স আব্দুর রহমান, যুবাইর ও তালহার কাছে যাবে, যদি তালহা মদীনায় থাকে (তালহা তখন মদীনার বাইরে ছিলেন) । তাদের একস্থানে সমবেত করবে। আব্দুল্লাহ ইবন উমরকেও হাজির করবে। তবে খিলাফতদের কোন হক তাঁর নেই। তাঁদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে। তাঁদের পাঁচজন যদি কোন একজনের ব্যাপারে একমত হয় এবং একজন দ্বিমত পোষন করে, তরবারী দিয়ে তাঁর কল্লা কেটে ফেলবে। আর যদি চারজন একমত হয় আর দু'ন ভিন্নমত পোষন করে, তবে সে দু'জনের কল্লা উড়িয়ে দিবে। আর যদি তিনজন করে দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায় তাহলে আব্দুল্লাহ ইবন উমর যে পক্ষ সমর্থন করবে, তারা তাদের মধ্য থেকে একজনকে নির্বাচিত করবে। অন্য পক্ষ যদি আব্দুল্লাহ বিন উমরের সিদ্ধান্ত না মানে তবে আব্দুর রহমান বিন আউফ যে দিকে থাকবে তোমরা সেদিকে যাবে। বিরোধীরা যদি জনগনের সিদ্ধান্ত না মানে তাহলে তাদেরকে মানতে বাধ্য করবে।

হযরত উমরকে দাফন করার পর মিকদাদ বিন আসওয়াদ শূরার সদস্যদের মিসওয়ার ইবনুল মাখরামা মতান্তরে হযরত আয়িশার হুজরায় একত্রিত করলেন। তাঁরা পাঁচজন। তালহা তখনো মদীনার বাইরে। তাঁদের সাথে যুক্ত হলেন আব্দুল্লাহ বিন উমার। বাড়ীর দরজায় প্রহরী নিয়োগ করা হলো আবু তালহাকে। বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা ও তুমুল বাক- বিতন্ডা হলো। এক পর্যায়ে আব্দুর রহমান বললেনঃ তোমাদের মধ্যে এমন কে আছ ? যে তার দাবী ত্যাগ করতে পার এবং তোমাদের উত্তম ব্যক্তিকে নির্বাচনের দায়িত্ব আমার উপর অর্পন করতে পার ? আমি আমার খিলাফতের দাবী ত্যাগ করছি। হযরত উসমান সর্ব প্রথম এ প্রস্তাবে রাজী হয়ে আব্দুর রহমানের হাতে তাঁর ক্ষমতা ন্যস্ত করলেন। তারপর অন্য সকলে তাঁর অনুসরন করলেন। এভাবে খলিফা নির্বাচনের গোচা দায়িত্ব আব্দুর রহমানের উর এসে বর্তায়।

হযরত আব্দুর রহমান দিনরাত হুজুর (সা) ‘র অন্যসব সাহাবী, মদীনার অবস্থানরত সকল সেনা অফিসার, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গসহ সকল স্তরের জনপ্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করলেন। কখনো ব্যক্তিগতভাবে, কখনো সম্মিলিতভাবে। প্রায় সকলেই হযরত উসমানের পক্ষে তাদের মতামত ব্যবত করলেন।

যেদিন সকালে হযরত উমরের নির্ধারিত সময় শেষ হবে, সে রাতে আব্দুর রহমান এলেন মাখরামার বাড়িতে। তিনি প্রথমে যুবাইর ও সা’দকে ডেকে মসজিদে নববীর সুফফায় বসে এক এক করে তাদের সাথে কথা বললেন, এভাবে উসমান ও আলী’র সাথেও সুবহে সাদিক পর্যন্ত একান্তে আলাপ করলেন।

এদিকে মসজিদে নববী লোকে লোকারণ্য। শেষ সিদ্ধান্তটি শোনার জন্য সবাই ব্যাকুল। ফজরের নামাজের পর সমবেত মদীনাবাসীর উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত এক ভাষনের পর আব্দুর রহমান খলীফা হিসেবে হযরত উসমানের নামটি ঘোষনা করেন এবং তাঁর হাতে বাইয়্যেত করেন। অতঃপর সমবেত জনসাধারন তাঁর হাতে বাইয়্যেত করেন। হিজরী ২৪ সনের পহেলা মুহররম সোমবার সকালে তিনি খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

হযরত উসমান অত্যন্ত নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে খিলাফতের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। খিলাফতের প্রথম পর্যায়ে তাঁর বিরুদ্ধ তেমন অভিযোগ শোনা যায় না। তবে শেষের দিকে বসরা. কুফা, মিশর প্রভৃতি অঞ্চল থেকে তাঁর বিরুদ্ধে অসন্তোষ দানা বেধে উঠতে থাকে। মূলতঃ এ অসন্তোষ সৃষ্টি পশ্চাতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে পরাজিত ইয়াহুদি শক্তি। ধীরে ধীরে তারা সংঘবদ্ধভাবে বিদ্রোহী হয়ে উঠে এবং মদীনায় খলিফার বাসভবন ঘেরাও করে। এই বিদ্রোহীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন ব্যক্তি ছিল না। তারা খলিফাকে হত্যার হুমকি দিয়ে পদত্যাগ দাবী করে। খলীফার বাসগৃহের খাদ্য ও পানি সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। মসজিদে নামাজ আদায়ে বাধার সৃষ্টি করে। এক পর্যায়ে তারা খলিফার বাড়িতে ঢুকে পরে এবং রোজা অবস্থায় কোরআন তেলওয়াতরত বয়োবৃদ্ধ খলিফাকে হত্যা করে। (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন) এ ঘটনা সংঘটিত হয় হিজরী ৩৫ সনের ১৮ই জিলহজ্জ শুক্রবার আসর নামাজের পর। রাসুল (সা) ‘র ওফাত ও হযরত উসমানের শাহাদাতের মধ্যে পচিশ বছরের ব্যবধান। বারো দিন কম বারো বছর তিনি খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন।

জান্নাতুল বাকী’র ‘হাশমে কাওয়াব’ নামক অংশে তাঁকে দাফন করা হয়। মাগরিব ও এশা’র মাঝামাঝি সময়ে তাঁর দাফনকার্য সমাধা হয়। যুবাইর ইবন মুতাঈম (রা) তাঁর জানাজার ইমামতি করেন। কাবুল থেকে মরক্কো পর্যন্ত বিশাল খিলাফতের কর্ণধারের জানাজায় মাত্র সত্তরজন লোক অংশগ্রহণ করেছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স কত হয়েছিল এ ব্যাপার মত পাথর্ক্য রয়েছে। তবে ৮২ হতে ৯০ বছরের মধ্যে ছিল।

খলিফা উসমান বিদ্রোহিদের দ্বারা ঘেরাও হওয়ার পর ইচ্ছে করলে তাদেরকে নির্মুল করতে পারতেন। অন্য সাহাবীরা সে জন্য প্রস্তুতও ছিলেন। কিন্ত হযরত উসমান নিজের জন্য কোন মুসলমানের রক্ত

ঝরাতে চাননি। তিনি চাননি মুসলমানদের মধ্যে রক্তপাতের সূচনাকারী হতে। প্রকৃতপক্ষে এমন এক নাজুক মুহূর্তে হযরত উসমান (রা) যে কর্ম পদ্ধতি অবলম্বন করেন তা একজন বাদশাহ ও খলিফার মধ্যে যে পার্থক্য তা স্পষ্ট করে তোলে। তাঁর স্থলে যদি কোন বাদশাহ হতো, নিজের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে যে কোন কৌশল প্রয়োগ করতে দ্বিধাবোধ করতো না। তাতে যত ক্ষতি বা ধ্বংসই হউক না কেন। কিন্ত তিনি ছিলেন খলিফা রাশেদ। নিজের জীবন দেয়াকে তুচ্ছ মনে করেছেন। তবুও যেন এমন সম্মান বিনষ্ঠ না হতে পারে যা একজন মুসলমানের সব কিছু থেকে প্রিয় হওয়া উচিৎ।

ইসলামের জন্য হযরত উসমানের অবদান মুসলিম জাতি কোনদিন ভুলতে পারবে না। ইসলামের সেই সংকটকালে আল্লাহর রাস্তায় তিনি যেভাবে খরচ করেছেন, অন্য কোন ধনাঢ্য মুসলমানের মধ্যে তার কোন নজির নাই। তিনি বিস্তর অর্থে বিণিময়ে ইয়াহুদী মালিকানাধীন 'বীরে- রুমা' কূপটি খরিদ করে মদীনার মুসলমানদের ওয়াকফ করেন। বিণিময়ে রাসুল (সা) তাঁকে জান্নাতের অঙ্গিকার করেন। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস! যিনি একদিন 'বীরে- রুমা' খরিদ করে মদীনাবসির পানি কষ্ট দুর করেছিলেন, তাঁর বাড়িতেই সেই কূপের পানি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। সেই ঘেরাও অবস্থায় একদিন তিনি জানালা দিয়ে মাথা বের করে মদীনাবাসিদের স্মরণ করে দিয়েছিলেন, রাসুলুল্লাহর (সাঃ) নির্দেশে আমিই 'বীরে- রুমা' খরিদ করে সর্ব সাধারনের জন্য ওয়াকফ করেছি। আজ সেই কূপের পানি থেকেই তোমরা আমাকে বঞ্চিত করছো। আমি আজ পানির অভাবে ময়লা পানি দিয়ে ইফতারী করছি।

হযরত উসমানের ফজিলত ও মর্যাদা সম্পর্কে রাসুল (সা) হতে যত হাদিস বর্ণিত হয়েছে তার সারকথাঃ তিনি রাসুলুল্লাহ (সা) এর খুব প্রিয় ছিলেন। রাসুলুল্লাহ (সা) এর নিকটতম ব্যক্তিদের মধ্যে তাঁর বিশেষ স্থান ছিল। রাসুলুল্লাহ (সা) বার বার তাঁকে জান্নাতের খোশখবর দিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন, প্রত্যেক নবীরই বন্ধু থাকে, জান্নাতে আমার বন্ধু হবে উসমান। হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর বলেনঃ রাসুলুল্লাহ (সা) এর সময়ে মুসলমানরা আবু বকর, উমর ও উসমানকে সকলের থেকে অধিক মর্যাদাবান মনে করতেন। তাছাড়া অন্য কোন সাহাবীকে বিশেষ কোন মর্যাদা দেয়া হতোনা। হযরত উসমান (রা) রাসুলুল্লাহ (সা) এর সময়ে 'কাতিবে- অহী' অহি লেখক ছিলেন। সিদ্দীকি ও ফারুকী যুগে ছিলেন উপদেষ্টা। প্রতি বছরই তিনি হজ্জ আদায় করতেন। তবে যে বছর শহীদ হন, ঘেরাও থাকার কারণে হজ্জ আদায় করতে পারেননি। সারা বছরই রোজা রাখতেন। সারা রাত ইবাদাতে কাটতো। এক রাকাআতে একবার কোরআন শরীফ খতম করতেন। রাতে কারো ঘুমে ব্যাঘাত ঘটাতেন না। রাতে চাকরদের খেদমত গ্রহণ করতেন না। তিনি ছিলেন অত্যন্ত লাজুক। রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ আমার উম্মতের মধ্যে উসমান সবরআধিক লজ্জাশীল। তিনি আরো বলেছেনঃ উসমানকে দেখে ফেরেশেতারাও লজ্জা পায়। আত্মীয়- বন্ধুদের প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত সদয়। তাঁর গুনাবলী ও মর্যাদা সংক্ষীপ্ত প্রবন্ধে প্রকাশ করা যাবে না।

প্রচেষ্টা
একটি ইসলামিক শিক্ষার ওয়েবসাইট

হযরত আলী (রা)

নাম আলী, লকব আসাদুল্লাহ, হায়দার ও মুরতজা, কুনিয়াত আবুল হাসান ও আবু তুরাব। পিতা আবু তালিব আবদু মান্নাফ, মাতা ফাতিমা। পিতা- মাতা উভয়ে কুরাইশ বংশের হাশিমী শাখার সন্তান। আলী রাসূলুল্লাহর (সা) আপন চাচাতো ভাই।

রাসূলুল্লাহর (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির দশ বছর পূর্বে তাঁর জন্ম। আবু তালিব ছিলেন ছাপোষা মানুষ। চাচাকে একটু সাহায্য করার উদ্দেশ্য রাসূল (সা) নিজ দায়িত্বে নিয়ে নেন আলীকে। এভাবে নবী পরিবারের একজন সদস্য হিসাবে তিনি বেড়ে ওঠেন। রাসূল (সা) যখন নবুওয়াত লাভ করেন, আলীর বয়স তখন নয় থেকে এগারো বছরের মধ্যে। একদিন ঘরের মধ্যে দেখলেন, রাসূলে করীম (সা) ও উম্মুল মমিনীন হযরত খাদীজা (রা) সিজদাবনত। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এ কি? উত্তর পেলেন, এক আল্লাহর ইবাদাত করছি। আলী তাঁর মুরব্বির দাওয়াত বিনা দ্বিধায় কবুল করেন। মুসলমান হয়ে যান। কুফর, শিরক ও জাহিলিয়্যাতের কোন অপকর্ম তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি।

রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে সর্ব প্রথম হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা) নামায আদায় করেন। এ ব্যাপারে কোন মতপার্থক্য নেই। অবশ্য আবু বকর, আলী ও যায়েদ বিন হারেসা- এ তিন জনের কে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহন করেছিলেন, সে সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। (তাবাকাতঃ ৩/২১) ইবন আব্বাস ও সালমান ফারেসীর (রা) বর্ণনা মতে, উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজার (রা) পর আলী (রা) সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে এই সম্পর্কে সবাই একমত যে, মহিলাদের মধ্যে হযরত খাদীজা, বয়স্ক আযাদ পুরুষদের মধ্যে আবু বকর, দাসদের মধ্যে যায়িদ বিন হারেসা ও কিশোরদের মধ্যে আলী (রা) প্রথম মুসলান ।

নবুওয়াতের তৃতীয় বছরে রাসূলে কারীম (রা) হুকুম দিলেন আলীকে, কিছু লোকের আপ্যায়নের ব্যবস্থা কর। আবদুল মুত্তালিব খান্দানের সব মানুষ উপস্থিত হল। আহার পর্ব শেষ হলে রাসূল (রা) তাদের কে সম্বোধন করে বললেনঃ আমি এমন এক জিনিস নিয়ে এসেছি, যা দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ের জন্য কল্যাণকর। আপনাদের মধ্যে কে আমার সঙ্গী হবে? সকলেই নীরব। হঠাৎ আলী (রা) বলে উঠলেনঃ যদিও আমি অল্পবয়স্ক, চোখের রোগে আক্রান্ত, দুর্বল দেহ, আমি সাহায্য করবো আপনাকে।

হিজরাতের সময় হল। অধিকাংশ মুসলমান মক্কা ছেড়ে মদীনা চলে গেছেন। রাসূলে করীম (সা) আল্লাহর হুকুমের প্রতীক্ষায় আছেন। এ দিকে মক্কার ইসলাম বিরোধী শক্তি সিদ্ধাত নিয়েছে, রাসূলে কারীমকে (সা) দুনিয়া থেকে চিরতরে সরিয়ে দেয়ার। আল্লাহ তাঁর রাসুলকে (সা) এ খবর জানিয়ে দেন।। তিনি মদীনায় হিজরাতের অনুমতি লাভ করেন। কাফিরদের সন্দেহে না হয়, এ জন্য আলী (রা) কে রাসুল (সা) নিজের বিছানায় ঘুমোবার নির্দেশ দেন এবং সিদ্দিকে আকবরকে সঙ্গে নিয়ে রাতের আঁধারে মদীনা রওয়ানা হন। আলী (রা) রাসুলে কারীমের (সা) চাদর মুড়ি দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে অত্যন্ত

আনন্দ সহকারে ঘুমালেন। তিনি জানতেন, এ অবস্থায় তার জীবন চলে যেতে পারে। কিন্তু তাঁর প্রত্যয় ছিল, এভাবে জীবন গেলে তাঁর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কিছু হবে না। সুবহে সাদিকের সময় মক্কার পাষণ্ডরা তাদের অসৎ উদ্দেশ্যে ভেতরে প্রবেশ করে দেখত পেল, রাসূলে কারীমের (সা) স্থানে তাঁরই এক ভক্ত জীবনেজর করবানীর জন্য প্রস্তুত হয়ে শুনে আছে। তারা ব্যর্থ হয় এবং আল্লাহ তাআলা আলীকে (রা) হিফাজত করেন।

এ হিজরাত প্রসঙ্গে হযরত আলী (রা) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনা রওয়ানার পূর্বে আমাকে নির্দেশ দিলেন, আমি মক্কায় থেকে যাব এবং লোকদের যেসব আমানত তাঁর কাছে আছে তা ফেরত দেব। এ জন্যেই তো তাকে আল- আমীন বলা হতো। আমি তিন দিন মক্কায় থাকলাম। তারপর রাসূলুল্লাহর (সা) পথ ধরে মদীনার দিকে বেরিয়ে পরলাম। অবশেষে বনী আমর ইবন আওফ – যেখানে রাসূল (সা) অবস্থান করছিলেন, আমি উপস্থিত হলাম। কুলসুম ইবন হিদমের বাড়ীতে আমার আশ্রয় হল। অন্য একটি বর্ণনায়, আলী (রা) রবিউল আউয়াল মাসের মাঝামাঝি কুবায় উপস্থিত হন। রাসূল (সা) তখনও কুবায় ছিলেন।

মাদানী জীবনের সূচনাতে রাসূল (সা) যখন মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে মুয়াখাত বা দ্বীনি- ভ্রাতৃ সম্পর্ক কায়েম করছিলেন, তিনি নিজের একটি হাত আলীর (রা) কাঁধে রেখে বলেছিলেন, আলী তুমি আমার ভাই। তুমি হবে আমার এবং আমি হব তোমার উত্তারাধিকারী। পরে রাসূল (সা) আলী ও সাহল বিন হুনাইফের মধ্যে ভ্রাতৃ সম্পর্ক কায়েম করে দিয়েছিলেন।

হিজরী দ্বিতীয় সনে হযরত আলী (রা) রাসূলে কারীমের (সা) জামাই হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) প্রিয়তমা কন্যা খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতেমা (রা) সাথে তাঁর বিয়ে হয়।

ইসলামের জন্য হযরত আলীর (রা) অবদান অবিস্মরণীয়। রাসূলে করীমের (সা) যুগের সকল যুদ্ধে সবচেয়ে বেশী সাহসিকতা ও বীরত্বের পরিচয় তিনি দেন। এ কারণে হুজুর (সা তাঁকে হায়দার উপাধিসহ যুল- ফিকার নামক একখানি তরবারি দান করেন।

একমাত্র তাবুক অভিযান ছাড়া সকল যুদ্ধেই তিনি অংশগ্রহণ করেন। বদরে তাঁর সাদা পশমী রুমালের জন্য তিনি ছিলেন চিহ্নিত। কাতাদা থেকে বর্ণিত। বদরসহ প্রতিটি যুদ্ধে আলী ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা)'র পতাকাবাহী। উহুদে যখন অন্যসব মুজাহিদ পরাজিত হয়ে পলায়নরত ছিলেন, তখন যে ক'জন মুষ্টিমেয় সৈনিক রাসূলুল্লাহকে (সা) কেন্দ্র করে ব্যুহ রচনা করেছিলেন, আলী (রা) তাদের একজন। অবশ্য পলায়নকারীদের প্রতি আল্লাহর ক্ষমা ঘোষিত হয়েছে।

ইবন ইসহাক হতে বর্ণিত। খন্দকের দিনে আমর ইবন আবদে উদ্দ বর্ম পরে বের হল। সে হুংকার ছেড়ে বললোঃ কে আমার সাথে দ্বন্দযুদ্ধে অবতীর্ণ হবে? আলী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, হে আমার নবী, আমি প্রস্তুত। রাসূল (সা) বললেনঃ এ হচ্ছে আমর তুমি বস। আমর আবার প্রশ্ন ছুড়ে দিলঃ আমার সাথে

লড়বার মতো কেই নেই? তোমাদের সেই জান্নাত এখন কোথায়, যাতে তোমাদের নিহতরা প্রবেশ করবে বলে তোমাদের ধরণা? তোমাদের কেউ এখন আমার সাথে লড়তে সাহসী নয়? আলী (রা) উঠে দাড়াঁলেন। বললেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি প্রস্তুত। রাসূল (সা) বললেন বস। তৃতীয় বারের মত আহবান জানিয়ে আমর তার স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলো। আলী (রা) আবারো উঠে দাঁড়িয়ে আরজ করলেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি প্রস্তুত। রাসূল (সা) বললেন সে তো আমর। আলী (রা) বললেনঃ তা হোক। এবার আলী (রা) অনুমতি পেলেন। আলী (রা) তার একটি স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করতে করতে আমরের দিকে এগিয়ে গেলেন। আমর জিজ্ঞেস করলো তুমি কে ? বললেন আলী (রা)। সে বললোঃ আবদো মান্নফের ছেলে? আলী বললেনঃ আমি আবু তালিবের ছেলে আলী। সে বললোঃ ভাতিজা, তোমার রক্ত ঝরানো আমি পছন্দ করি না। আলী বললেনঃ আল্লাহ কসম, আমি কিন্তু তোমার রক্ত ঝরানো অপছন্দ করিনে। এ কথা শুনে আমর ক্ষেপে গেল। নিচে নেমে এসে তরবারি বের কর ফেললো। সে তরবারি যেন আগুনের শিখা। সে এগিয়ে আলীর ঢালে আঘাত করে ফেঁড়ে ফেললো। আলী পাল্টা এক আঘাতে তাকে ধরাশায়ী করে ফেললেন। এ দৃশ্য দেখে রাসূল (সা) তাকবীর ধ্বনি দিয়ে উঠেন। তারপর আলী নিজের একটি স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করতে করতে রাসূলুল্লাহ (সা) কাছে ফিরে আসেন।

সপ্তম হিজরীতে খাইবার অভিযান চালানো হয়। সেখানে ইয়াহুদীদের কয়কেটি সুদৃঢ় কিল্লা ছিল। প্রথমে সিদ্দীকে আকবর পরে ফারুকে আজমকে কিল্লাগুলি পদানত করতে দ্বায়িত্ব দেয়া হয়। কিন্ত তাঁরা কেউই সফলকাম হতে পারলেন না। নবী (সা) ঘোষনা করলেন, কাল আমি এমন এক বীরের হাতে ঝান্ডা তুলে দিব যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রিয়পাত্র। তারই হাতে কিল্লাগুলোর পতন হবে। পরদিন সকালে সাহাবীদের সকলেই আশা করেছিলেন এই গৌরবটি অর্জন করার। হঠাৎ আলীর (রা) ডাক পরল। তাঁরই হাতে খাইবারের সেই কিল্লাগুলির পতন হয়।

তাবুক অভিযানে রওয়ানা হবার সময় রাসুলুল্লাহ (সা) আলীকে (রা) মদীনায় স্থলাভিষিক্ত করে যান। আলী (রা) আরজ করলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ (সা) আপনি যাচ্ছেন আর আমাকে নারী ও শিশুদের কাছে ছেড়ে যাচ্ছেন ? উত্তরে রাসুলুল্লাহ (সা) বললেনঃ হারুন যেম,ন ছিলেন মুসার, তেমনিআ তুমি হচ্ছ আমার প্রতিনিধি। তবে আমার পরে কোন নবী নেই।

নবম হিজরীতে মুসলমানদের নিয়ন্ত্রনে প্রথম ইসলামী হজ্জ অনুষ্ঠিত হয়। এ বছর হযরত সিদ্দিকে আকবর ছিলেন ‘আমিরুল হজ্জ’ তবে কাফিরদ;এর সাথে সম্পাদিত সকল চুক্তি বাতিল ঘোষনার জন্য রাসুলুল্লাহ (সা) আলীকে (রা) বিশেষ দূত হিসেবে পাঠান।

দশম হিজরীতে ইয়ামেনে ইসলাম প্রচারের জন্য হযরত খালিদ সাইফুল্লাহকে পাঠানো হয়। ছ’মাস চেষ্টার পরেও তিনি সফলকাম হতে পারলেন না। ফিরে এলেন। রাসুলুল্লাহ (সা) আলীকে (রা) পাঠানোর কথা ঘোষনা করলেন। আলী (রা) রাসুলুল্লাহ (সা)’র কাছে উপস্থিত হয়ে বললেনঃ আপনি আমাকে এমন লোকদের কাছে পাঠাচ্ছেন যেখানে নতুন নতুন ঘটনা ঘটবে অথচ বিচার ক্ষেত্রে আমার কোন অভিজ্ঞতা

নেই। উত্তরে রাসুলুল্লাহ (সা) বললেনঃ আল্লাহ তোমাকে সঠিক রায় ও তোমার অন্তের শক্তিদান করবেন। তিনি আলি (রা)'র মুখে হাত রাখলেন। আলী বললেনঃ অতঃপর আমি কক্ষনো কোন বিচারে দ্বিধাগ্রস্ত হইনি। যাওয়ার আগে রাসুলুল্লাহ (সা) নিজ হাতে আলীর (রা) মাথায় পাগড়ী পরিয়ে দোআ করেন। আলী ইয়ামেনে পৌঁছে তাবলীগ শুরু করেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যে সকল ইয়ামেনবাসী ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং হামদান গোত্রের সকলেই মুসলমান হয়ে যায়। রাসুলুল্লাহ (সা) আলীকে (রা) উৎকন্ঠিত হয়ে পরেন। তিনি দুআ করেন, আল্লাহ আলীকে না দেখে যেন আমার মৃত্যু না হয়। হযরত আলী (রা) বিদায় হজ্জের সময় ইয়ামেন থেকে হাজির হয়ে যান।

রাসুলুল্লাহ (সা) 'র ওফাতের পর তাঁর নিকত্মীয়রাই কাফন- দাফনের দায়িত্ব পালন করেন। হযরত আলী (রা) গোসল দেওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। মুহাজির ও আনসাররা তখন দরজার বাইরে অপেক্ষমান ছিলেন।

হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত উসমানের খিলাফত মেনে নিয়ে তাঁদের হাতে বাইয়্যেত করেন, এবং তাঁদের যুগের সকল গুরুত্বপুর্ণ সিদ্ধান্তে শরীক থাকেন। অর্ত্যন্ত নাজুক পরিস্থিতেও হযরত উসমানকে পরামর্শ দিয়েছেন। যেভাবে আবু বকরকে 'সিদ্দিক' উমরকে 'ফারুক' এবং উসমানকে গণী বলা হয়, তেমনিভাবে তাঁকেও 'আলী মুরতাজা' বলা হয় । হযরত আবু বকর ও উমররে যুগে তিনি মন্ত্রী ও উপদেষ্টার ভূমিকা পালন করেন। হযরত উসমানও সবসময় তাঁর সাথে পরামর্শ করতেন।

বিদ্রোহীদের দ্বার হযরত উসমান ঘেরাও হলে তাঁর নিরাপত্তার ব্যাপারে হযরত আলীই(রা) সবচেয়ে বেশী ভুমিকা পালন করেন। সেই ঘেরাও অবস্থায় হযরত উসমানের বাড়ির নিরাপত্তার জন্য তিনি তাঁর দুই পুত্র হাসান ও হুসাইন (রা) কে নিয়োগ করেন।

হযরত উমর ইন্তেকালের পূর্বে ছ'জন বিশিষ্ট সাহাবীর নাম উল্লেখ করে তাঁদের মধ্য থেকে কাউকে পরবর্তী খিলফা নির্বাচনের অসিয়ত করে যান। হযরত আলী (রা) ও ছিলেন তাদের একজন। মৃত্যুর পুর্বে তিনি আলী (রা) সম্পর্কে মন্তব্য করেনঃ লোকেরা যদি আলীকে খলিফা বানায় তবে সে তাদেরকে সঠিক রাস্তায় পরিচালিত করতে পারবে। হযরত উমর তাঁর বাইতুল মুকাদ্দাস সফরের সময় আলীকে মদীনায় নিজের স্থলাভিষিক্ত করে যান।

হযরত উসমানের (রা) শাহাদাতের পর বিদ্রোহীরা হযরত তালহা, যুবাইর ও আলীকে (রা) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য চাপ প্রয়োগ করে। প্রত্যেকেই অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে অস্বীকৃতি জানায়। বিভিন্ন বর্ণনার মাধ্যমে জানা যায়,হযরত আলী বার বার এ প্রস্তাব প্রত্যখান করতে থাকেন। অবশেষে মদীনাবাসীরা হযরত আলী'র (রা) কাছে গিয়ে বলে, খেলাফতের এ পদ এভাবে শুন্য থাকতে পারে না। বর্তমানে এ পদের জন্য আপনার হতে উপযুক্ত ব্যক্তি আর কেউ নেই। আনিই এ পদের হকদার। মানুষের পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত তিনি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হন। তবে শর্ত আরোপ করেন যে,

আমার বাইয়্যেত গোপনে হতে পারবে না। এজন্য সর্বশ্রেনীর মুসলমানের সম্মতি প্রয়োজন। মসজিদে নববীতে সাধারন সভা হলো। মাত্র ষোল অথবা সতেরজন সাহাবী ছাড়া সকল মুহাজির ও আনসার আলী'র (রা) হাতে বাইয়্যেত গ্রহণ করেন।

অত্যন্ত জটিল এক পরিস্থিতর মধ্যে হযরত আলী'র খিলাফতের সূচনা হয়। খলীফা হওয়ার পর তাঁর প্রথম কাজ ছিল হযরত উসমানের (রা) হত্যাকারীদের শাস্তি বিধান করা। কিন্ত কাজটি সহজ ছিল না। প্রথমতঃ হত্যাকারীদের কেউ চিনতে পারেনি। হযরত উসমানের স্ত্রী হযরত নায়িলা হত্যাকারীদের দেখেছিলেন,কিন্ত তিনি তাদের কাউকে চিনতে পারেননি। মুহাম্মদ বিন আবু বকর হত্যার উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন,কিন্ত হযরত উসমানের এক ক্ষোভ উক্তির মুখে তিনি পিছটান দেন। মুহাম্মদ বিন আবু বকরও হত্যাকারীদের চিনতে পারেননি।
দ্বিতীয়তঃ মদীনা তখন হাজার হাজার বিদ্রোহীদের কব্জায়। তারা হযরত আলী'র (রা) সেনাবাহিনীর ভিতের ঢুকে পরেছে। কিন্ত তাঁর এই অসহায় অবস্থা তৎকালীন অনেক মুসলমানই উপলব্দি করেননি। তারা হযরত আলি'র নিকট তক্ষুনি হযরত উসমানের 'কিসাস' দাবী করেন। এই দাবী উথথাপনকারীদের মধ্যে উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশাও (রা) সহ তালহা ও যুবাইরের (রা) মত সাহাবীও ছিলেন। তাঁরা হযরত আয়েশার (রা) নেতৃত্বে সেনাবাহিনীসহ মক্কা থেকে বসরার দিকে যাত্রা করেন। সেখানে তাঁদের সমর্থকদের সংখ্যা বেশী ছিল। হযরত আলীও (রা) তাঁর বাহিনীসহ সেখানে পৌছান। বসরার উপকন্ঠে বিরোধী দুই বাহিনী মুখামোখী হয়। হযরত আয়িশা (রা) আলী (রা)'র কাছে তাঁর দাবী পেশ করেন। আলী (রা) ও তাঁর সমস্যা সমূহ তুলে ধরেন। যেহেতু উভয় পক্ষেই ছিল সততা ও নিষ্ঠা তাই মিমাংসা হয়ে যায়। হযরত তালহা ও যুবাইর ফিরে চললেন। হযরত আয়িশাও ফিরার প্রস্তুতি শুরু করলেন। কিন্ত হাঙ্গামা ও অমান্তি সৃষ্টিকারীরা উভয় বাহিনীতেই ছিল। তাই আপোষ মীমাংসায় তারা ভীত হয়ে পরে। তারা সুপরিকল্পিতভাবে রাতের অন্ধকারে এক পক্ষ অন্য পক্ষের শিবিরে হামলা চালিয়ে দেয়। ফল এই দাড়ায় যে, উভয় পক্ষের মনে এই ধারনা জন্মালো যে, আপোষ মীমাংসার নামে ধোঁকা দিয়ে প্রতিপক্ষ তাঁদের উপর হামলা করে বসেছে । পরিপুর্ণ যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। হযরত আলীর জয় হয়। তিনি বিষয়টি হযরত আয়িশাকে বুঝাতে সক্ষম হন। আয়িশা বসরা থেকে মদীনায় ফিরে যান।

যুদ্ধের সময় হযরত আয়িশা উটের উপর সওয়ার ছিলেন, ইতিহাসে তাই এ যুদ্ধ উটের যুদ্ধ নামে সুপরিচিত। হিজরী ৩৬ সনের জমাদিউস সানী মাসে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আশারায়ে মুবাশশারার সদস্য হযরত তালহা ও যুবাইর সহ মোট তের হাজার মুসলমান শহীদ হন। অবশ্য এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। হযরত আলী (রা) পনেরদিন বসরায় অবস্থানের পর কুফায় চলে যান। রাজধানী মদীনা থেকে কুফায় স্থানান্তরিত হয়।

এই উটের যুদ্ধ ছিল মুসলমানদের প্রথম আত্মঘাতী সংঘর্ষ। অনেক সাহাবী এ যুদ্ধে কোন পক্ষেই যোগদান করেননি। এই আত্মঘাতি সংঘর্ষের জন্য তারা ব্যথিতও হয়েছিলেন। আলী(রা)'র বাহিনী যখন মদীনা হতে রওয়ানা হয়,মদীনাবাসীরা তখন কান্নায় ভেঙ্গে পরেছিলেন।

হযরত আয়িশা (রা)'র সাথেতো আপোষরফায় আসা গেল। কিন্ত সিরিয়ার গভর্ণর মুয়াবিয়ঙার সাথে কোন মীমাংসায় পৌছা গেল না। হযরত আলী (রা) তাকে সিরিয়ার গভর্ণর পদ থেকে বরখাস্ত করেন। হযরত মুয়াবিয়া বেকে বসলেন। আলী (রা)'র নির্দেশ মানতে অস্বীকার করলেন। তাঁর বক্তব্যের মুল কথা ছিল, উসমান হত্যার 'কিসাস' না হওয়া পর্যন্ত তিনি আলীকে খলিফা মানবেন না।

হিজরী ৩৭ সনের সফর মাসে সিফফীন নামক স্থানে হযরত আলী ও হযরত মুয়াবিয়া (রা)'র বাহিনীর মধ্যে এ সংঘর্ষ ঘটে যায়। এ সংঘর্ষ ছিল উটের যুদ্ধ হতেও ভয়াবহ। উভয় পক্ষে মোট নব্বই হাজার মুসলমান শাহাদাত বরন করেন। তাঁদের মধ্যে প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আম্মার বিন ইয়াসির, খুযাইমা ইবন সাবিত, ও আবু আম্মারা আল মাযীনিও ছিলেন। তাঁরা সকলেই হযরত আলীর পক্ষে হযরত মুয়াবিয়ার (রা) বাহিনীর হাতে শহীদ হন। উল্লেখ্য যে হযরত আম্মার বিন ইয়াসির রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছিলেনঃ আফসোস একটি বিদ্রোহী দল আম্মারকে হত্যা করবে। সাতাশজন প্রখ্যাত সাহাবী এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হযরত মুয়াবিয়াও একজন এ হাদীসটির বর্ণনাকারী্ অবশ্য হযরত মুয়াবিয়া হাদীসটির ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন । এতো কিছুর পরেও বিষয়টির ফয়সালা হলোনা।

সিফফীনের সর্বশেষ সংঘর্ষে যাকে লাইলাতুর হার বলা হয়, হযরত আলী (রা)'র জয় হতে চলেছিল। হযরত মুয়াবিয়া পরাজয়ের ভাব বুঝতে পেরে পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে মীমাংসার আহবান জানালেন। তাঁর সৈন্যেরা বর্শার মাথায় কোরআন ঝুলিয়ে উঁচু করে ধরে বলতে থাকে, এই কোরআন আমাদের দ্বন্ধের ফয়সালা করবে। যুদ্ধবিরতী ঘোষিত হলো। হযরত আলী (রা)'র পক্ষে হযরত আবু মুসা আসয়ারী(রা) এবং হযরত মুয়াবিয়ার পক্ষে হযরত আমর ইবনুল আস 'হাকাম' বা শালিশ নিযুক্ত হলেন। সিদ্ধান্ত হলো এই যে, এই দুইজনের সম্মিলিত ফয়সালা বিরোধী দু'পক্ষই মেনে নিবেন। 'দুমাতুল জান্দাল' নামক স্থানে মুসলমানদের বড় আকারের এক সম্মেলন হয়। কিন্ত সব ঐতিহাসিক তথ্য বিশ্লেষন করলে যা পাওয়া যায় তা হল, হযরত 'আমর ইবনুল আস' (রা) হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রা)'র সাথে যে সিদ্ধান্তে উপনিত হয়েছিলেন, শেষ মুহুর্তে তা থেকে সরে আসায় এ সালিশী বোর্ড শান্তি স্থাপনে ব্যর্থ হয়। দুমাতুল জান্দাল থেকে মুসলমানরা হতাশ হয়ে ফিরে গেল। অতঃপর হযরত আলী (রা) ও হযরত মুয়াবিয়া অনর্থক রক্তপাত বন্ধ করার লক্ষ্যে সন্ধি করলেন। এ দিন ধথেকে মুলতঃ মুসলিম খিলাফত দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়।

এ সময় খারেজী নামে নতুন একটি দলের জন্ম হয়। প্রথমে তারা ছিল হযরত আলী(রা)'র সমর্থক। কিন্ত পরে তারা এ বিশ্বাষ প্রচার করতে থাকে যে, দ্বীনের ব্যাপারে কোন মানুষকে 'হাকাম' বা সালিশ নিযুক্ত করা 'কুফরী কাজ। আলী (রা) আবু মুসা আশয়ারীকে হাকাম মেনে নিয়ে কোরআন খেলাফের কাজ

করেছেন। সুতরাঙ হযরত আলী তাঁর আনুগত্য দাবী করার বৈধতা হারিয়ে ফেলেছেন। তারা হযরত আলী (রা) হতে পৃথক হয়ে যায়। তারা ছিল অত্যন্ত চরমপন্থী। তাদের সাথে হযরত আলী (রা)'র একটি যুদ্ধ হয় এবং তাতে বহুলোক হতাহত হয়।

এই খারেজী সম্প্রদায়ের তিন ব্যক্তিআব্দুর রহমানমুজলিম,আল- বারাক ইবন আবদিল্লাহ,আমর ইবন বকর আততামীমী নাহরাওয়ানের যুদ্ধের পর এক গোপন বৈঠকে মিলিত হয়। দীর্ঘ আলোচনার পর তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, মুসলিম উম্মার অর্ন্তকলহের জন্য দায়ী মুলতঃ আলী (রা), মুয়াবিয়া (রা), আমর ইবনুল আস (রা)। সুতরাং এই তিন ব্যক্তিকে দুনিয়া হতে সরিয়ে দিতে হবে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক ইবন মুলজিম দায়িত্ব নিল আলী (রা)'র এবং আল- বারাক ও আমর দায়িত্ব নিল যথাক্রমে মুয়াবিয়া (রা) আমর ইবনুল আস (রা)'র । তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, মারবে নয়তো মরবে। হিজরী ৪০ সনের ১৭ই রমজান ফজরের নামাজের সময়টি এ কাজের জন্য নির্ধারিত হয়। অতঃপর ইবন মুলজিম কুফা, আল-বারাক দামেস্ক ও আমর মিসরে চলে যায়।

হিজরী ৪০ সনের ১৬ই রমজান শুক্রবার দিবাগত রাত্রে আততায়ীরা আপন আপন স্থানে ওৎপেতে থাকে। ফজরের সময় হযরত আলী (রা) অভ্যাসমত আস- সালাত বলে মানুষকে নামাজের জন্য ডাকতে ডাকতে যখন মসজিদের দিকে যাচ্ছিলেন,পাপাত্মা ইবন মুলজিম শাণিততরবারী নিয়ে ঝাপিয়ে পরে তাঁকে আহত করে। আহত অবস্থায় আততায়ীকে ধরার নির্দেশ দিলেন। সন্তানদের ডেকে অসিয়ত করলেন। চার বছর নয়মাস খিলাফতপরিচালনার ১৭ই রমজার ৪০ হিজরী শনিবার কুফায় শাহাদাত বরণ করেন।

একই দিন একই সময় হযরত মুয়াবিয়া যখন মসজিদে যাচ্ছিলেন,তাঁরও উপর হামলা হয়। কিন্ত তা ব্যর্থ হয়। তিনি সামান্য আহত হন। অন্যদিকে আমর ইবনুল আস অসুস্থতার কারণে সেদিন মসজিদে যাননি। তাঁর পরিবর্তে পুলিশ বাহিনীর প্রধান খারেজ ইবন হুজাফা ইমামতির দায়িত্ব পালনের জন্য মসজিদে যাচ্ছিলেন। তাঁকেই আমর ইবনুল আস মনে করে হত্যা করা হয়। এভাবে মুয়াবিয়া ও ইবনুল আস (রা) প্রাণে রক্ষা পান।

হযরত আলী (রা)'র নামাজে জানাজার ইমামতী করেন হযরত হাসান ইবন আলী (রা) কুফা জামে মসজিদের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়। তবে অন্য একটি বর্ণনা মতে নাজফে আশরাফে তাঁকে সমাহিত করা হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর।

আততায়ী ইবন মুলজিমকে ধরে আনা হলে আলী (রা) নির্দেশ দেনঃ সে কয়েদী। তার থাকা খাওয়ার সু-ব্যবস্থা কর। আমি বেঁচে গেলে তাকে হত্যা বা ক্ষমা করতে পারি। যদি আমি মারা যাই, তোমরা তাকে ততটুকুই আঘাত করিবে যতটুকু সে আমাকে করেছে। তোমরা বাড়াবাড়ি করোনা। যারা বাড়াবাড়ি করে আল্লাহ তাদের ভালবাসেন না।

হযরত আলী ৫বছর খিলাফত পরিচালনা করেন। একমাত্র সিরিয়া ও মিসর ছাড়া মক্কা ও মদীনাসহ সব এলাকা তাঁর অধীনে ছিল। তাঁর সময়টি যেহেতু গৃহযুদ্ধে অতিবাহিত হয়েছে সেহেতু এ সময়ে নতুন কোন অঞ্চল বিজিত হয়নি।

হযরত আলী (রা) তাঁর পরে অন্য কাউকে স্থলাভিষিক্ত করে যাননি। লোকেরা যখন তাঁর পুত্র হযরত হাসানকে (রা) খলিফা নির্বাচিত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলঃ তিনি বলেছিলেন, এ ব্যাপারে তোমাদের নির্দেশ বা নিষেধ কোনটাই করছিনা। অন্য এক ব্যক্তি যখন জিজ্ঞেস করেছিল, আপনি আপনার প্রতিনিধি নির্বাচন করে যাচ্ছেন না কেন ? আলী বললেনঃ আমি মুসলিম উম্মাহকে এমনভাবে ছেড়ে যেতে চাই যেমন ছেড়ে গিয়েছিলেন রাসুল (সা)।

হযরত আলী (রা)'র ওফাতের পর 'দারুল খিলাফা' –রাজধানী কুফার গনগণ হযরত হাসান (রা)কে খলিফা নির্বাচন করে। তিনি মুসলিম উম্মাহর অর্ন্তকলহ ও রক্তপাত পছন্দ করলেন না। এ কারণে হযরত মুয়াবিয়া ইরাক আক্রমণ করলে যুদ্ধের পরিবর্তে মুয়াবিয়ার হাতে খিলাফতের ক্ষমতা ছেড়ে দেয়া সমীচিন মনে করলেন। এভাবে হযরত হাসানের (রা) নজীরবিহীন কোরবানী মুসলিম জাতিকে গৃহযুদ্ধের হাত থেকে মুক্তি দেয়। খিলাফত থেকে তাঁর পদত্যাগের বছরকে ইসলামের ইতিহাসে 'আমুল-জামাআহ' ঐক্য ও সংহতির বছর নামে অভিহিত করা হয়। পদত্যাগের পর হযরত হাসান কুফা ত্যাগ করে মদীনায় চলে আসেন এবং নয় বছর পর হিজরী ৫০ সনে মদীনায় ইন্তিকাল করেন। মাত্র ছয়মাস তিনি খিলাফত পরিচালনার সুযোগ পেয়েছিলেন।

হযরত উমর (রা) হযরত আলী (রা) সম্পর্কে বলেছিলেনঃ আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ফয়সালা কারী আলী (রা)। এমনকি রাসুল (সা) বলেছেনঃ 'আকদাহুম আলী' তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিচারক আলী। তাঁর সঠিক সিদ্দান্ত লক্ষ্য করে হযরত উমর একাধিকবার বলেছেনঃ 'লাওলা আলী লাহালাকা উমার' আলী না হলে উমর হালাক হয়ে যেত।

আলী (রা) নিজেকে একজন সাধারন মুসলমানের সমান মনে করতেনএবং যে কোন ভুলের কৈফিয়তের জন্য তৈরী থাকতেন। একবার এক ইহুদী তাঁর বর্ম চুরি করে নেয়। আলী (রা) বাজারে বর্মটি বিক্রি করতে দেখে চিনে ফেলেন। তিনি ইচ্ছে করলে জোর করে তা নিতে পারতেন। কিন্ত তিনি তা করেন নি। আইন অনুযায়ী ইহুদীর বিরুদ্ধে কাজীর আদালতে মামলা দায়ের করেন। কাজীও ছিলেন কঠোর ন্যায় বিচারক। তিনি আলীর (রা) দাবীর সমর্থনে প্রমাণ চাইলেন। আলী (রা) প্রমাণ দিতে পারলেন না। কাজী ইহুদীর পক্ষে রায় দিলেন। এই রায়ের প্রভাব ইহুদীর উপর এতখানি পরেছিল যে, সে মুসলমান হয়ে যায়। সে মন্তব্য করেছিল, এতো নবীদের মত ইনসাফ। আলী (রা) আমীরুল মোমেনীন হয়ে আমাকে কাজীর সামনে উপস্থিত করেছেন এবং তাঁরই নিযুক্ত কাজী তাঁর বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন। তিনি হযরত ফাতিমা,র (রা) সাথে বিয়ের পুর্ব পর্যন্ত রাসুলে কারীম (সা)'র পরিবারের সাথেই থাকতেন। বিয়ের পর পৃথক বাড়িতে বসবাস শুরু করেন। জীবিকার প্রয়োজন দেখা দিল। কিন্ত পুঁজি ও উপকরণ কোথায়?

গতরে খেটে ও গণীমতের হিস্সা থেকে জীবিকা নির্বাহ করতেন। হযরত উমরের যুগে ভাতা চালু হলেতাঁর ভাতা নির্ধারিত হয় বছরে পাঁচ হাজার দিরহাম। হযরত হাসান বলেনঃ মৃত্যুকালে একটি গোলাম খরিদ করার জন্য জমা করা মাত্র সাতশত দিরহাম রেখে যান।

জীবিকার অনটণ আলী'র ভাগ্য থেকে কোনদিন দূর হয়নি। একবার স্মৃতিচারণ করে বলেছিলেন, রাসুল (সা)'র সময়ে ক্ষুধার জ্বালায় পেটে পাথর বেঁধে থেকেছি। খলিফা হওয়ার পরেও ক্ষুধা ও দারিদ্রের সাথে তাঁকে লড়তে হয়েছে। তবে তাঁর অন্তরটি ছিল অত্যন্ত প্রশান্ত। কোন অভাবীকে তিনি ফিরাতেন না। এজন্য তাঁকে অনেক সময় সপরিবারে অভুক্ত থাকতে হয়েছে। তিনি ছিলেন দারুণ বিনয়ী । নিজের হাতেই ঘর- গৃহস্থালীর যাবতীয় কাজ করতেন। সর্বদা মোটা পোশাক পরতেন। তাও ছেড়া, তালি লাগানো। তিনি ছিলেন জ্ঞানের দরজা। দূর- দূরান্ত থেকে মানুষ জ্ঞানার্জনের এসে দেখতে পেত তিনি উটের রাখালী করছেন, ভূমি কুপিয়ে ক্ষেত তৈরী করছেন। তিনি এতই অনাড়াম্বর ছিলেন যে, সময় সময় শুধু মাটির উপর শুয়ে যেতেন। একাবার তাঁকে রাসুল (সা) এ অবস্থায় দেখে সম্বোধন করেছিলেন,ইয়া আবা- তুরাব' ওহে মাটির অধিবাসী প্রাকৃতজন। তাই তিনি পেয়েছিলেন 'আবু তুরাব' উপাধীটি। খলীফা হওয়ার পরেও তাঁর এ সরল জীবন অব্যাহত থাকে। হযরত উমরের মত সব সময় একটি দুররা (ছড়ি) হাতে নিয়ে চলতেন। লোকদের উপদেন দিতেন।

হযরত আলী ছিলেন নবী খান্দানের সদস্য, যিনি নবীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শিক্ষা লাভ করেন। রাসুলে মাকবুল (সা) বলেছেনঃ 'আনা মাদীনাতুল ইলম ওয়া আলী বাবুহা' আমি জ্ঞানের নগরী,আর আলী সেই নগরীর প্রবেশদ্বার। তিনি ছিলেন আল কোরআনের হাফেজ ও একজন শ্রেষ্ঠ মুফাস্সির। কিছু হাদিসও সংগ্রহ করেছিলেন। তবে হাদিস গ্রহণের ব্যাপারে খুবই সতর্ক ছিলেন। কেউ তাঁর কাছে কোন হাদীস বর্ণনা করলে, বর্ণনাকারীর নিকট হতে শপথ নিতেন। তিনি রাসুলুল্লাহ (সা)'র বহু হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর থেকে বহু বিখ্যাত সাহাবী, তাবে'ঈ হাদীস বর্ণনা করেছেন। পুর্ববর্তী খলিফাদের যুগে মুহাজিরদের তিনজন ও আনসারদের তিনজন ফতোয়া দিতেন, যথাঃ উমর,উসমান, আলী, উবাই বিন কা'ব, মুয়াজ বিন জাবাল ও যায়িদ বিন সাবিত। মাসরুক থেকে অন্য একটি বর্ণনায় জানা যায়, রাসুলুল্লাহ (সা) এর সাহাবীদের মধ্যে ফতোয়া দিতেন,আলী, ইব মাসউদ, যায়িদ, উবাই বিন কা'ব,আবু মুসা আল আশয়ারী।

আলী ছিলেন একন সু- বক্তা ও ভাল কবি। তাঁর কবিতার একটি দিওয়ান আমরা পেয়ে থাকি। তাতে অনেকগুলি কবিতায় ১৪০০ শ্লোক আছে। গবেষকদের ধারনা তাঁর নামে প্রচলিত অনেকগুলি কবিতা প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। তবে তিনি যে তৎকালীন আরবী কাব্য জগতের একজন প্রখ্যাত দিকপাল ,তাতে পন্ডিতদের কোন সংশয় নেই। 'নাজুল বালাগা' নামে তাঁর বক্তৃতার একটি সংকলণ আছে যা তাঁর অতুলনীয় বাগ্মীতার স্বাক্ষর বহণ করে চলেছে।

খাতুনে জান্নাত নবী কন্যা হযরত ফাতেমা'র সাথে তাঁর প্রথম বিয়ে হয়। যতদিন ফাতেমা জীবিত ছিলেন ততদিন দ্বিতীয় বিয়ে করেননি। ফাতিমার মৃত্যুর পর একাধিক বিয়ে করেছেন। তাবারীর বর্ণনামতে, তায়র ১৪টি ছেলে ও ১৭জন মেয়ে জন্মগ্রহণ করে। হযরত ফাতেমা(রা)'র ঘরে তিনপুত্র হাসা,হুসাইন ও মুহসিনএবং দু;কন্যা জয়নাব ও উম্মু কুলসুম জন্মলাভ করেন। শৈশবেই মুহসিন মারা যায়। ওয়াকিদীর বর্ণনামতে মাত্র পাঁচ হাসান,হুসাইন,মুহাম্মাদ(ইবনুল হানাফিয়্যা) আব্বাস উমার থেকে তাঁর বংশ ধারা চলছে। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আলি'র (রা) মর্যাদা ও ফজিলত সম্পর্কে রাসুল (ষা) থেকে যত কথা বর্ণিতহয়েছে,অন্য কোন সাহাবী সম্পর্কে তা হয়নি। ইতিহাসে তা২র যতগুনাবলী বর্ণিত হয়েছে এরকম সংক্ষিপ্ত প্রবন্দে তার কিয়দংশও তুলে ধরা সম্ভব নয়। রাসুল (সা) অসংখ্যবার তাঁর জন্য ও তাঁর সন্তানদের জন্য দুআ' করেছেন। রাসুল (সা) বলেছেনঃ একমাত্র মুমিনরা ছাড়া কেউ তোমাকে ভালবাসবেনা এবং একমাত্র মুনাফিক ছাড়া কেউ তোমাকে হিংসে করবে না।

হযরত আলী'র এক সাথী হযরত দুরার ইবন দামরা আল কিনানী একদিন হযরত মুয়াবিয়ার কাছে এলেন। মুয়াবিয়া তাঁকে আলী (রা)'র গুনাবলী বর্ণনা করতে অনুরোধ করেন, প্রথমে তিনি অস্বীকার করেন। কিন্ত মুয়াবিয়ার চাপাচাপিতে দীর্ঘ এক বর্ণনা দান করেন। তাতে হযরত আলী (রা)' র গুনাবলী চমৎকারভাবে ফুটে উঠে। ঐতিহাসিকরা বলেছেন, ও বর্ণনা শুনে মুয়াবিয়াসহ তাঁর বৈঠকে উপস্থিত সকলেই কান্নায় ভেঙ্গে পরেছিলেন। অতঃপর মুয়াবিয়া মন্তব্য করেনঃ 'আল্লাহর কসম,আবুল হাসান (হাসানের পিতা) এমনই ছিলেন'।

প্রচেষ্টা
একটি ইসলামিক শিক্ষার ওয়েবসাইট